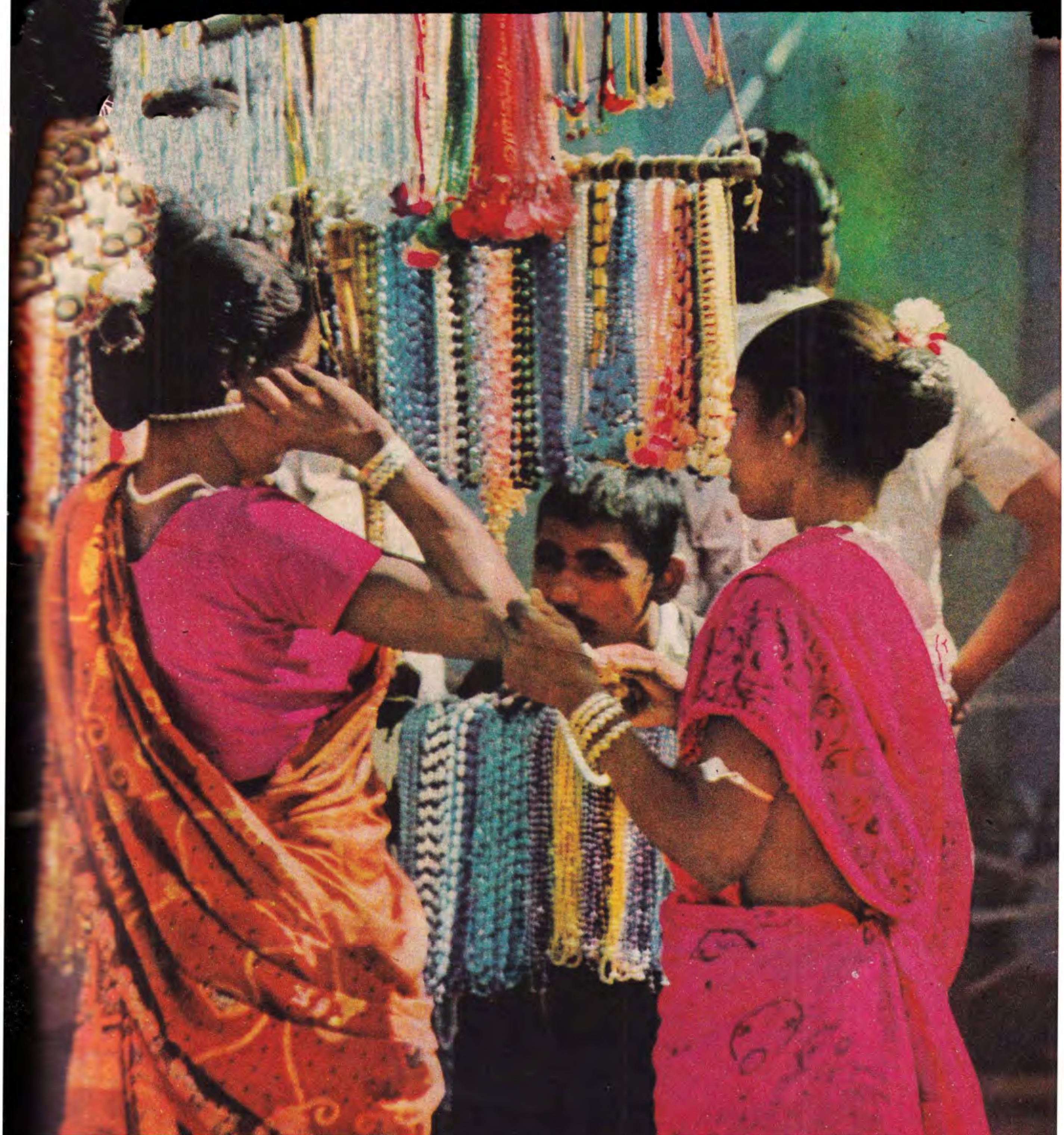
# পরিবর্তন

৭ জানুয়ারী ১৯৮১



## শহুরে ভিড় পৌষমেলাকে নোংরা করে ফেলেছে




পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

স্ক্যান ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

# একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com


এক-চক্ষু জলদস্যু
ূল কাহিনী ঃ রবিদাস সাহারায়
ত্র কাহিনী ঃ অলোক দত্ত
ল্পী ঃ পোলারিস
৩১
যেই ক্যাপ্টেন সউপ দেখতে গেল আওয়াজটা কোথা থেকে এল অমনি নেডের তরবারি আঘাত করল ওর কাপড়েবাঁধা চোখটায়।
চোখ থেকে একটা চকচকে জিনিস খসে পড়ল মাটিতে।
এইতো সেই 'জগতের জ্যোতি'। যা ও রাজপুলের মন্দির থেকে চুরি করেছিল।
শয়তানটার একটা জব্বর আঘাত থেকে বাঁচার জন্য নেড যেই একটু সরে গেল ও চাইল পাথরটা কুড়িয়ে নিতে।
নেড ওকে ওটা নিতে দিও না। তাহলে ওকে মারা যাবে না।
কথাটা শুনেই বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে গেল নেড। শয়তান সউপ সামলে ওঠার আগেই নেডের তরবারি বসে গেল ওর বুকে।
'জগতের জ্যোতি'কে পকেটে ঢোকাবার পরই নেড দেখতে পেল একটু দূরের একটা গুহা থেকে দশজন দস্যু বেরিয়ে আসছে।

# পরিবর্তন

৭ জানুয়ারি ১৯৮১ তৃতীয় বর্ষ, চতুর্দশ সংখ্যা দাম ১.৫০ টাকা

বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ২৫ পয়সা

## সম্পাদকীয়

ভারতের অর্থনীতিকে একটা দুমুখো তেজী ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা দেওয়া যেতে পারে। তার একটি মুখ প্রতিনিয়ত ছুটে চলতে চায় অন্ধকারাচ্ছন্ন চির দারিদ্র্যের পথে, অন্যটি পৌঁছাতে চায় সমৃদ্ধির সোনালি শিখরে। ফলে ভিতরে ভিতরেই তৈরি হচ্ছে এক প্রচণ্ড একরোখা সংঘাত।

ঔপনিবেশিক অর্থনীতির কবল থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি তেত্রিশ বছর আগে। তারপর শুরু হয়েছে জাতীয় অর্থনীতির কাল। পণ্ডিতেরা অনেক চুলচেরা হিসাব-নিকাশ করে ভারতের জন্য নিদান হেঁকে ছিলেন মিশ্র অর্থনীতির। এই জগাখিচুড়ি বস্তুটি এ দেশের কোটি কোটি নিরন্ন মানুষের মুখে ক' দানা অতিরিক্ত অন্ন তুলে দিতে পেরেছে ?

বিশেষ যে পারেনি সে কথা সকলেই স্বীকার করেন। পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন সদস্য অধ্যাপক রামকৃষ্ণ 'সায়েনটিফিক আমেরিকান' নামে এক মারকিন পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে অধ্যাপক মহোদয় জানিয়েছেন ভারত দুনিয়ার সবচেয়ে গরিব ৩৬টি দেশেরই একটি। দারিদ্র্য সীমার নিচে পড়ে রয়েছেন—এমন মানুষের সংখ্যা প্রতি বছরই বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৭৭-৭৮ সালে এ দেশে দারিদ্র্য-সীমার নিচে পড়ে থাকা মানুষের সংখ্যা ছিল ৩৩ কোটির মত। কিছুদিন আগে পরিকল্পনা দফতরের মন্ত্রী রাজ্যসভায় জানিয়েছেন : ১৯৭৭-৭৮ সালে দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৮.১৩ জনই ছিল দারিদ্র্যরেখার নিচে। এ হার আবার শহর ও গ্রামে দু' রকম। গ্রামের মানুষদের শতকরা ৫০.৮২ জনই দারিদ্র্য সীমার নিচে। ওড়িশায় শতকরা ৫৯.৭৩ জন মানুষ ঐ সীমার নিচে পড়ে আছে।

দারিদ্র্য-সীমা ব্যাপারটাও আসলে একটা পোশাকী কথা মাত্র। এ সীমার অর্থ নিয়েও পণ্ডিতে-পণ্ডিতে তর্কের শেষ নেই। কিন্তু নগ্ন সত্য কথাটা হল : দেশের কোটি কোটি মানুষ দু'বেলা দূরের কথা, এক বেলাও পেট ভরে খেতে পায় না ; লক্ষ লক্ষ পরিবারের মেয়েদের একখানা ত্যানাও সব সময় জোটে না, আশ্রয় অনেকেরই শহরের ফুটপাত, স্টেশন প্লাটফরম, ব্রিজের নিচের অংশ কিংবা পরিত্যক্ত ওয়াগন। সেখানেই চলে প্রাতঃকৃত্য থেকে প্রজনন পর্যন্ত জীবনের সব আবশ্যিক কর্ম।

...িতে যখন যারা বসেন তারা নানা পরিসংখ্যানের ঢক্কা বাজিয়ে বোঝাতে চান—দেশ বেশ এগিয়ে চলছে, গরিবী হটে যাচ্ছে এবং দেশে সমাজতান্ত্রিক ধরনের সমাজ গড়ে উঠছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বড় বড় কথা শুনে অনেকেই গোঁফে হাসেন প্রকাশ্যে হয়ত বাহবাও দেন। কারণ, তারা জানেন দেশটাকে তারাই চালাচ্ছেন, রাজনীতির নেতারা তাদেরই দম দেওয়া পুতুল মাত্র। তারা যেমন শেখান, ওরা তেমনি গান।

...ই দু'বছরেই দেশের ২৫টি শিল্প-পরিবারের মোট টাকার অঙ্ক দেড় হাজার কোটি ... বেড়ে যায়। ১৯৭৬ সালে ওদের মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ...২১৯.৩৭ কোটি টাকা ; ১৯৭৮ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১০,৭০৯.৬৬ কোটি টাকায়। পাশাপাশি এ সময়ে কোটি খানেক নতুন মানুষ নিঃস্বের দলে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন।

...দিন আগে কলকাতায় মারচেন্ট চেমবার অব কমারসের আলোচনা চক্রে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ ভবতোষ দত্ত আগামী পাঁচ বছর গাড়ি, টি ভি এবং বড় ...টেল তৈরি বন্ধ রেখে খাদ্যশস্য, প্রাথমিক শিক্ষা, সস্তার কাপড় এবং পানীয় জল সরবরাহে ঐ টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব রেখেছেন। সাধু প্রস্তাব, কিন্তু ...েই ভালো। কাজে করবে কে ?

...নে প্রতিবেশী পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার চেয়েও ভারতের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ বেশ কম। এ লজ্জাই বা ঘোচাবে কে ? শুধু কথা দিয়েই কি চিরকাল চিঁড়ে ভেজানোর চেষ্টা চলবে ?

## এই সংখ্যায়



সমীপেষু / ২
অম্লমধুর / ৫
মিলিটারি স্টোরে চুরি ও লাজারের মৃত্যু রহস্য
সুদীপ মজুমদার / ৬
নারী-বিশ্ব / ৮
নিবারণ চক্রবর্তীর বঙ্গদর্পণ / ৯
শ্যামলী মারা গেল কেন ?
বিশ্বজিৎ সিংহ / ১১
শ্যামলীর ডায়েরি
বিশেষ প্রতিনিধি / ১২
ইস, কেন মারলাম ওকে ?
বিশেষ প্রতিনিধি / ১৩
শান্তর চিঠি, বেবিকে / ১৪
শহুরে ভিড় পৌষমেলাকে নোংরা করে ফেলছে
যীশু চৌধুরী / ১৭
শান্তিনিকেতন : অতীত চিত্র
চিত্তরঞ্জন দেব / ২১
নাগারা সমতলে এলে বলেন—ভারতে এলাম
মানসরঞ্জন সেনগুপ্ত / ২৬
গ্রামীণ বড়লোকদের জন্যেই খালকাটা বিপ্লব
যীশু চৌধুরী / ৩০
ওপার বাংলা / ৩১
বিশ্ববিচিত্রা / ৩৩
বেশির ভাগ বাঙালী দর্শকের পছন্দ প্রেমের ছবি
চন্দন চৌধুরী/দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়/৩৪
ঘরোয়া / ৪১
উগানডায় ফিরেছেন ওবোটে এবং ভারতীয়রাও
বল্মীক / ৪২
রাজ্যে রাজ্যে / ৪৩
জেলায় জেলায় / ৪৩
সাম্প্রতিক ছবি : পরশুরাম / ৪৪
নাট্য-সমীক্ষা / ৪৭
চিত্র প্রদর্শনী / ৪৭
সংস্কৃতি সংবাদ / ৪৭
এই সপ্তাহ / ৪৮

প্রচ্ছদ আলোকচিত্র : অরূপ দত্ত
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : নিতাই ঘোষ

সম্পাদক : অশোক চৌধুরী
সংযুক্ত সম্পাদক : ধীরেন দেবনাথ
শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

# সমীপেষু

## কাজীর গান

১ ডিসেম্বর ১৯৮০ সংখ্যার পরিবর্তনে কাজী নজরুলের গান প্রসঙ্গে তপন সেন মহাশয়ের পত্রাঘাতে অতিশয় প্রীত হলাম। সুধীর চক্রবর্তী মহাশয়ের শারদসংখ্যার লেখায় 'জনপ্রিয়' শিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে অতিকথনের যে তিনি নির্ভীক বিরোধিতা করেছেন, স্বকীয়তা অন্যের কাছে বন্ধক রেখে তিনি যে 'রাজবস্ত্র সত্যিই অতীব সূক্ষ্ম' বলে মেনে নেননি সেজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। একই সঙ্গে মূল লেখকের আত্মপক্ষ সমর্থনের ভঙ্গিমাটিও লক্ষ্য করলাম। মনে হলো সুধীরবাবু যেন তপনবাবুর সত্য বচনে অহেতুক রোষপূর্বক অবিরাম দিকবিদিক বিরূপ মন্তব্যের অসিচালনা করেছেন যা কিনা সঠিক সমালোচনাকে বানচাল করার প্রচেষ্টা বলেই মনে হয়। এটা সাধারণ পাঠক হিসাবে অনেকেরই হয়তো গ্রহণযোগ্য হবে না। সুধীরবাবু কি সমালোচনাকে ভয় পান? প্রশ্ন জাগে।

সুধীরবাবু, মানবেন্দ্র মুখারজিকে এখনকার নজরুলগীতির অবিসম্বাদী গায়ক বলেছেন। তিনি নাকি খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে আসীন। জানিনা সুধীরবাবুর মতো 'শুভবুদ্ধিসম্পন্ন' লেখকের বিচারের মাপকাঠিটা কি? মনে হয় রেকর্ড সংখ্যা ও তার বাণিজ্যিক সাফল্যের নিরিখেই তিনি তার 'সাঙ্গীতিক মূল্যায়নের' সত্যতা রক্ষা করতে চেয়েছেন। সুধীরবাবুকে প্রশ্ন করি, সংখ্যা কি উৎকর্ষের দ্যোতক? এই কারণেই কি তিনি ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সুকুমার মিত্র প্রমুখের যথার্থ স্থান নির্ণয় করতে পারেন নি?

মানবেন্দ্রবাবু যে নজরুলগীতি নিয়ে Experimentation-এ মেতেছেন এবং 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' তা নিয়ে যথেচ্ছাচার করে থাকেন এ ব্যাপারে তপনবাবুর সঙ্গে আমারও কোন দ্বিমত নেই। ১৯৬৭ সালে রেকর্ড করা গান 'এত জল ও কাজল চোখে' ও তৎপরবর্তী সময়ে 'বাগিচায় বুলবুলি তুই' ও এইরূপ আরও কিছু গানে মানববাবুর Twing কোন কোন ক্ষেত্রে মোটেই সুখশ্রাব্য নয়। ঐ একই গান ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সুললিত কণ্ঠে বহুবার শুনেছি, যার Rendering-এ গানের অন্তর্নিহিত ভাবমূর্তিটিই বারবার ধরা পড়েছে। তাছাড়া গজলধর্মী নয় এমন গান নিয়ে মানববাবুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংগীতের উৎকর্ষ বাড়ায় কি?

সুধীরবাবু, নজরুলগীতিতে সুরবিকাশের অবাধ স্বাধীনতা আছে—সুর বিকৃতির নয়। এটা আশা করি মানববাবুও মনে রাখবেন। অবশ্য তার মধ্যে বাস করছে এক Promethean Rebel. মানববাবু নজরুলগীতিকে তার ডেসটিনি বলে মনে করেন। জানিনা তা ওপরে ওঠানোর না অন্য কিছুর। প্রসঙ্গক্রমে একসময় এক বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত মানববাবুর গায়নভঙ্গী সম্পর্কে সমালোচকের একটি সুন্দর উক্তি মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন মানববাবু আধুনিক গানের সুরে নজরুলগীতি গেয়ে থাকেন। তপনবাবুর চিঠি প্রসঙ্গে দ্বিতীয়বার কথাটি মনে পড়ল।

উপরন্তু সুধীরবাবু বলেছেন, মানববাবুর আগে অর্থাৎ ১৯৬৭ সালের আগে নজরুলগীতির রেকর্ড ছিল হাতে গোনা—জ্ঞান গোঁসাই, ধীরেন মিত্র, আঙুরবালা, ইন্দুবালা, গিরীন চক্রবর্তী ও সতীনাথের। জানিনা তপনবাবু উল্লিখিত গায়ক-গায়িকাদের কি করে তিনি একদম ভুলে গিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত জানাই যে ১৯৩২ থেকে শুরু করে ৪৪/৪৫ সাল পর্যন্ত টুইন, হিন্দুস্থান ও হিজ মাস্টারস ভয়েস-এ প্রচুর নজরুলগীতির রেকর্ড বেরিয়েছিল। অবশ্য সুধীরবাবু এ ব্যাপারে বাজারের উল্লেখ করেছেন। তবে কি তিনি অমুক সিং অরোরাদের রেকর্ড দাপটকে জগন্ময় মিত্র, সুধীরলালদের ওপরের সারিতে জায়গা করে দেবেন? জানিনা তিনি কি ধরনের বাংলা গানের শুভার্থী। সংশয় হয়।

সুধীরবাবুকে বলি, হাল্কা হাওয়ায় ভেসে চলা অধিকাংশ বাঙালী গান চায় ঠিকই। তবে ভালো গান চায় ও বোঝে সব ক্ষেত্রেই এটা মানতে পারলাম না। তবুও যে কজন সঠিক জিনিসটি চায়, সঠিক সুরের মূর্ছনায় প্লুত হতে চায়, আপনি তাদের জন্য অবশ্যই মানববাবুকে অনুরোধ করবেন তিনি যেন কাজী সাহেবের 'আমার উপলব্ধি'কে অর্থাৎ তাঁর সংগীতকে একটু ঠিক পথে চালাতে সচেষ্ট হন—ক্ষমতাবান তিনি. তার যেন অপব্যবহার না হয়। তাহলে অতি সত্ত্বর আমরা বাংলা গানের সেই শ্রুতিমধুর ধারাকে হারিয়ে ফেলবো যা নজরুলের গানের মাঝে এখনও বিদ্যমান বলে আমি মনে করি।

সুধীরবাবু, আপনি নিশ্চয়ই এবারেও Hamlet-এর মত বলবেন না: Begger I am, even I am poor in thanks. জানিনা তপনবাবু লুকিয়ে থাকা রমেশ দত্ত কিনা—আমি কিন্তু সেই ক্ষমতার ক্ষমতাবান নই। আপনার কথা রাখতে পারবো না তা আগেই জানিয়ে রাখলাম। আমি শুধু চেয়েছি: Not to win but to take part / Not the triumph but the struggle / Not to have conquered but to have fought সম্ভবত তপনবাবুও সত্যরক্ষার্থে সেটাই চেয়েছিলেন।

**বিপ্লব বিশ্বাস, করিমপুর, নদীয়া**

॥ ২ ॥

তপন সেনের চিঠি (পরিবর্তন, ১ ডিসেম্বর, ১৯৮০) পড়লাম। উনি সাড়ে তিন স্তম্ভের বক্তব্য এক লাইনেই সেরে ফেলতে পারতেন। সেটা হল, 'মানবেন্দ্রর গান আমি মোটেই পছন্দ করি না।'

নজরুলগীতি সম্বন্ধে তপনবাবুকে কিছু বলব না যতদিন না উনি সুধীর চক্রবর্তীর অনুরোধমত রমেশচন্দ্র দত্তের উদাহরণে সঙ্গীত বিষয়ে কিছু লেখেন। কিন্তু ওনার লেখা (সজ্ঞানে না অজ্ঞানে, জানি না) কয়েকটা কথার প্রতিবাদ করব, বাংলাগানের একজন শ্রোতা হিসেবে।

তপনবাবু লিখেছেন, 'নজরুলগীতি অবলম্বন করার আগে উনি (মানবেন্দ্র) জনগণের কাছে বিস্মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন।' এরকম হয় নাকি? তবে কি রবীন্দ্রসঙ্গীত বা নজরুলগীতির যেসব লব্ধপ্রতিষ্ঠ বা যশস্বী শিল্পী আছেন তারা অন্য গান গেয়ে বিস্মৃতপ্রায় হয়ে তারপর রবীন্দ্রসঙ্গীত বা নজরুলগীতি অবলম্বন করে বিখ্যাত হয়েছেন? যাই হোক, তপনবাবু কি 'লালুভুলু'র গান শুনেছিলেন, (যদিও সুরকার ছিলেন স্বর্গত রবীন চট্টোপাধ্যায়) যা আজও বাংলা ছায়াছবির গানের জগতে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে বা 'মায়ামৃগ'র গান (যেখানে 'যারে যা…' একটা 'experiment')? অথবা ইদানীংকালে সঙ্গীতে দুটো পুরস্কার পাওয়া, অনেক সফল 'experiment'-এ ভরা 'জয়জয়ন্তী'র গান বা 'সুদূর নীহারিকা'র গান? তপনবাবুর অজ্ঞানতা 'জনগণের বিস্মৃতি' হতে পারে না, তাই না? আর এগুলো থেকে প্রমাণ হয় যে নজরুলগীতি অবলম্বন না করলেও (আমার মতে, যা করে মানবেন্দ্র নিজেকে সম্মানিত এবং নজরুল সম্পর্কে নিজের আন্তরিক 'মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধা' প্রকাশ করেছেন) মানবেন্দ্র বাংলাগানে একটা নিজস্ব ধারা সৃষ্টি করে যেতে পারতেন, বা ইতিমধ্যেই কিছুটা করেছেন। আর, কোন বিশেষ স্রোতের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি বলেই মানবেন্দ্র প্রকৃত শিল্পী, গানের ফেরীওয়ালা নন।

'কুহু কুহু…' প্রসঙ্গে তপনবাবুকে একটা বিষয় স্মরণ করিয়ে দিই। নিউ থিয়েটারসের বিখ্যাত 'মুক্তি' ছায়াছবিতে রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কবিতায় সুরারোপ করে গেয়েছিলেন স্বর্গত পঙ্কজ কুমার মল্লিক। কয়েকবছর আগে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সেই 'দিনের শেষে…' গানটি গেয়েছেন নতুন করে, তপনবাবুর তথাকথিত 'গায়কী'র আমূল পরিবর্তন করে। এতে কি রবীন্দ্রনাথ বা পঙ্কজবাবুকে অশ্রদ্ধা করা হয়েছে। না, তপনবাবুরা 'অতৃপ্ত' হয়েছেন?

মানবেন্দ্র তো ১৯৬৭ সাল থেকে নজরুলগীতি গাইছেন, তা এই ১৩ বছরের মধ্যে তপনবাবুর সময় হল না, এ নিয়ে কিছু বলার?

তপনবাবুর জাগ্রত শুভবুদ্ধির কাছে প্রশ্ন করি, স্বর্গত দেবব্রত বিশ্বাসের কথা মনে আছে কি? তিনিও কিন্তু কতিপয় ক্ষমতাসম্পন্ন তপনবাবুদের উৎপাতে বানপ্রস্থ নিয়েছিলেন এবং শেষে 'শিল্পীসুলভ অতৃপ্তি' নিয়েই ফিরে গেছেন।

সুধীর চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ জানাই নতুন স্বাদের অপূর্ব লেখাটির জন্যে, আর সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে অনুরোধ জানাই, নজরুলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে যে মহান দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন, তা থেকে কখনোই কোনও destructive criticism-এর ভয়ে একপা-ও পিছু হটবেন না। ইতিহাস আপনার পক্ষে।

**প্রণব পাল, কলকাতা ৫।**

॥ ৩ ॥

পরিবর্তন ১৯৮০ শারদীয় সংখ্যায় সুধীর চক্রবর্তীর লেখাটি পড়েছি। পরিবর্তন, ১ ডিসেম্বর ১৯৮০ সংখ্যায় সেই প্রসঙ্গে প্রকাশিত চিঠিগুলিও পড়লাম। বিমান মুখোপাধ্যায়ের বানানো সুরে অথবা মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিজেই সুর দিয়ে নজরুলগীতি রেকর্ড করেন এরকম প্রমাণ আমার কাছে আছে। H.M.V রেকর্ডে প্রকাশিত মানবেন্দ্রর কণ্ঠে 'যাও মেঘদূত' গানটি এরূপ একটি দৃষ্টান্ত। নজরুলের Training-এ গানটি রেকর্ড হয়েছিল ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে এবং রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে। শিল্পী ছিলেন বিজনকুমার বসু। তিনি এখনও আকাশবাণী থেকে খেয়াল, ঠুংরী এবং কীর্তন পরিবেশন করেন। নজরুলের নিজের দেওয়া সুর থাকা সত্ত্বেও মানবেন্দ্র

গানটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে রেকরড করেছেন। বর্তমান সুরটি কার দেওয়া এঁরাই বলতে পারবেন। অনুরূপ অভিযোগ নজরুলের অন্য একটি গান,—'তুমি প্রভাতের সকরুণ ভৈরবী' সম্বন্ধেও আছে। নজরুলের Training-এ এই গানটি ছিল আমার প্রথম রেকরড। H.M.V রেকরডে এই গানটি অনুপ ঘোষাল অনেকাংশে ভিন্ন সুরে গেয়েছেন। তথ্যাদি সহ নজরুলের এই গান দুটি সম্বন্ধে গ্রামোফোন কোমপানির কাছে অভিযোগ জানাই ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে। সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত লেখালেখি করি। কিন্তু সব জেনে বুঝেও গ্রামোফোন কোম্পানি মৌন থাকাই সমীচীন বিবেচনা করেন।

আলোচ্য দুটি নজরুলগীতিই হিন্দুস্থান রেকরড কোমপানি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। হিন্দুস্থান, বর্তমানে ইনরেকো, কোমপানিতে আমি তথ্যপ্রমাণাদি (যথা হিন্দুস্থান কোমপানির ১৯৪২ সালের সেপটেমবর এবং ডিসেমবর মাসের মুদ্রিত ক্যাটালগ এবং গ্রামোফোন রেকরড) দেখাই। তারা অনুসন্ধান করে দেখবেন বলে জানান। 'যাও মেঘদূত' গানটি নজরুলের মূল সুরে ধীরেন বসুকে দিয়ে রেকরড করে প্রকাশ করলেন এবার নজরুল জয়ন্তীতে। গানটি পুনঃপ্রচার করে তারা নজরুলকৃত মূল সুরটি রক্ষা করলেন আবার নজরুলগীতি রেকরডিং-এর ব্যাপারে তাদের প্রধান Trainer ও সহায় বিমান মুখোপাধ্যায়ের সম্মানও ক্ষুন্ন করলেন না। এভাবে শ্যাম এবং কুল দুইই রক্ষা করা হল।

এ বিষয়ে কোন নামোল্লেখ না করে 13th Oct. 1979 তারিখের Statesman পত্রিকায় আমার একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। শিল্পীদ্বয় অথবা তাদের Trainer কারুরই মর্যাদাহানি করা আমার অভিপ্রেত ছিল না। নজরুলকৃত মূল সুর যাতে চিরতরে হারিয়ে না যায়—সেই ছিল আমার উদ্দেশ্য। বর্তমানে 'পরিবর্তন' পত্রিকায় ব্যাপারটি যখন খোলাখুলি আলোচনা হয়েছে তখন এ ব্যাপারে আমার উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট নামোল্লেখ করে খোলাখুলি বলতে বাধা [illegible] না।

বিমান মুখোপাধ্যায় যে প্রামাণ্য সুরে নজরুলগীতি শেখান না তথ্য প্রামাণ্যসহ দুটি রেকরড কোমপানির কাছেই আমি সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছি আলোচ্য নজরুলগীতি দুটির সুর প্রসঙ্গে। এরূপ বিবেকহীন কুকর্ম আরও হয়ে থাকতে পারে। সুতরাং যথেষ্ট বিলম্বে হলেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ভেবে দেখতে হবে নজরুলগীতির প্রামাণ্য একজন Trainer হিসাবে বিমান মুখোপাধ্যায় কতখানি বরণীয় ও নির্ভরযোগ্য অথবা নিন্দনীয় ও বর্জনীয়। রেকরড কোমপানিগুলি, নজরুলগীতির শিল্পী এবং অগণিত নজরুল-অনুরাগী সে বিচার করবেন।

**সুশীল চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা-২৭**

## বাঁকুড়ার মিশনারি

'পরিবর্তনে' 'মিশনারিরা কি গোলযোগ পাকাচ্ছে?' শীর্ষক রচনাটির সম্পর্কে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। পরিবর্তন নিউজ ব্যুরো ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, হুগলী, নদীয়া, উত্তরবঙ্গ, কলকাতা ও বাঁকুড়ায় মিশনারিরা কে কী কাজ করছেন তার কিছু কিছু তথ্য প্রকাশ করেছেন। এ সম্পর্কে আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নেই। কিন্তু বাঁকুড়ায় মিশনারিরা কে কী কাজ করছেন এবং তা কাদের অনুকূলে তা আমরা জানি। বিশেষ করে রেভারেণ্ড খৃস্টচরণ পাণ্ডে ও LAMP এর সেক্রেটারি শ্রীমলয় দেওয়ানজী সম্বন্ধে আমরা বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল। তাই এঁদের সম্পর্কে সত্য সমাচারটি জনসমক্ষে তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন। সৎ সাংবাদিকতা জনমানসে একটি চেতনা ও আদর্শের পরিমণ্ডল গড়ে তোলে; অন্যথায় অনেক অবাঞ্ছনীয় সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে।

প্রথমেই বলি, রেভারেণ্ড খৃস্টচরণ পাণ্ডে এই বাঁকুড়ারই সন্তান। তাঁর পিতা ১৮৯০ সালে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন। রেভারেণ্ড পাণ্ডে এই জেলার একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী। তাঁর কর্মজীবনের সমস্তটাই সেবার অমিয়ব্রতে উৎসর্গীকৃত। দীন-দরিদ্র-আর্ত-পীড়িত সমাজের অবহেলিত কুষ্ঠ রোগীদের অশ্রুমোচনে স্বনামধন্য ডাঃ অনাথবন্ধু রায় 'পদ্মজা নাইডু আরোগ্যাবাস' (কুষ্ঠরোগ নিরাময়োত্তর কেন্দ্র) স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে দ্বিধাবিভক্ত (কোন এক মহান কুষ্ঠ রোগীর কার্যকলাপে) যখন এই আরোগ্যাবাস, সেই দুর্দিনে সমবেত আদিবাসী ভাই-বোন ও অন্যান্য বর্ণহিন্দু রোগী ভাই-বোনদের বারান্তরে আকুল আহ্বান ও অকুণ্ঠ অনুরোধে ১৯৭২ সালে রেভারেণ্ড পাণ্ডে এই আরোগ্যাবাসে আসেন এবং পরে তিনি পরিচালন সমিতির কার্যকরী সভাপতি হয়ে দ্বিধাবিভক্ত রোগী ভাই-বোনদের একত্রিত করে তাদের কল্যাণে সেবাকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। স্বর্গত ডাঃ অনাথবন্ধু রায়ের পর এই জেলায় কুষ্ঠরোগীদের রেভারেণ্ড পাণ্ডের ন্যায় এমন সুহৃদ আর কেউ নেই।

তিনি যখন এই আরোগ্যাবাসে আসেন তখন এখানকার সমস্ত স্তরের রোগী ভাই-বোনদের একমাত্র জীবিকার্জনের উপায় ছিল, জি আর ও টি আর (অপ্রতুল ও অনিয়মিত) এবং ভিক্ষাবৃত্তি। বাসস্থান বলতেও ছিল মাত্র ১৪/১৫টি টিনের ঘর। তারপর রেভারেণ্ড পাণ্ডের কঠোর কর্ম প্রয়াসে এখানে বহু ঘর-বাড়ি, হসটেল, কৃষিকার্য, পুকুর খনন, বনসৃজন, মৎস্যচাষ, শিল্প শিক্ষাকেন্দ্র, চর্মশিল্প, বয়নশিল্প, বেত ও বাঁশের কাজ, টেলারিং ইত্যাদি সমাজের সাধারণ প্রয়োজনের সমস্ত কিছুই এই আরোগ্যাবাসে সরকারী ও বেসরকারী সমাজসেবা সংস্থাগুলির সাহায্যে ধীরে ধীরে রূপায়িত হয়েছে। সরকার থেকে 'ইনভেলিড কুষ্ঠরোগী'দের জন্য গ্রানট সংগ্রহ করে তাদের ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করেন। আরোগ্যাবাসের রোগীদের জন্য চিকিৎসারও ব্যবস্থা তিনি করেছেন।

এই আরোগ্যাবাসের কোন আদিবাসী ভাই কি বোন কিংবা কোন হিন্দুকে কখনও কোন প্রলোভনে তিনি ধর্মান্তরিত করেননি। অনেক দৃষ্টান্ত আছে, অনেকে স্বেচ্ছায় খৃস্টধর্ম গ্রহণ করার জন্য তাঁর কাছে আবেদন রেখেছেন কিন্তু তিনি সস্নেহে তাঁদের বুঝিয়ে, অনেক সময় নিরুত্তর থেকে তা থেকে তাঁদের নিবৃত্ত করেছেন। হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও আস্থা গভীর। খৃস্টান কলেজে যখন তিনি স্ক্রিপচারের ক্লাস নিতেন তখন একবার কম্পারেটিভ ধর্মালোচনায় তিনি বলেছিলেন—'Hinduism is an Ocean, whereas Christianity is a streamlet.' (Christian College, Platinum Jubilee, Issue, 1980) হিন্দুধর্মের প্রতি একজন খৃস্টভক্তের কত বড় শ্রদ্ধা থাকলে একথা বলা যায়। অতএব 'বু হেভেন' বসে ধর্মান্তরণের কাজও করছেন'—এই কথাটি বিশেষ দুরভিসন্ধিমূলক। 'মাঝে মাঝেই ওয়ারকিং প্রেসিডেনট, পদ্মজা নাইডু আরোগ্যাবাস নামে বিদেশী সেবা সংস্থা চারচ-মিশন থেকে টাকা আসে। সে টাকা কোথায় যায়, কি হয় কেউ জানে না।' এবং 'এই অভিযোগ নিয়ে জেলা সমাহর্তার কাছে স্মারক পত্রও দেওয়া হয়েছে।' জেলা সমাহর্তার কাছে কে বা কারা স্মারকলিপি দিয়েছেন, তা আমাদের জানা নেই, কারণ রেভারেণ্ড পাণ্ডেকে এই আরোগ্যাবাসের সকলেই অন্তর দিয়ে ভালোবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন। তাঁরা রেভারেণ্ড পাণ্ডের জন্যই আজ দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাচ্ছেন। তাঁদেরকে মানুষের মর্যাদা তিনিই দিয়েছেন।

এ ছাড়াও বাঁকুড়ার বহু মানুষ তাঁর কর্মকৃতিত্বে বিভিন্ন চাকুরিতে ও বিভিন্ন সংস্থায় চাকুরি পেয়েছিল ও পাচ্ছেন। যাদের কেউ কোথাও নেই, যাদের নির্ভর করার কোথাও কিছু নেই—তাদের সকলের আশ্রয়স্থল এই পান্থপাদপ রেঃ খৃস্টচরণ পাণ্ডে।

পরিবর্তনের এই সংখ্যায় রেঃ পাণ্ডের যে ছবিগুলি (Photographs) ছাপা হয়েছে, রচনাগুলির সঙ্গে তার কোথাও কোন যোগসূত্র নেই। ছবিগুলি পত্রিকা অলংকরণের জন্য দেওয়া হয়েছে না এর পশ্চাতে কোন গূঢ় ইঙ্গিত আছে?

কুষ্ঠরোগীরা (Negative বা Positive) এখনও হিন্দুধর্মের বহু ধ্বজাধারীদের নিকট অচ্ছুৎ ও ঘৃণার পাত্র। সেক্ষেত্রে রেঃ পাণ্ডে তাদের দুঃখ-কষ্ট-ব্যথা বেদনায় অনাহারে অর্ধাহারে যদি তাঁর স্নেহসিক্ত দক্ষিণ হস্ত বাড়িয়ে দেন, তবে তা কি মানবতার উচ্চকোটির কার্য হিসেবে বিশ্বজন-মানসে সৎ-চিৎ আনন্দের উদঘোষণা করবে না? না তাঁকে চক্রান্তকারীর কূট-কৌশলে এইসব সর্বহারাদের থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য করা হবে? তার মত মানুষদের বিচ্ছিন্নতাবাদী, সমাজের অহিতকারী বলে আমরা আজ যদি দূরে সরিয়ে দিই তবে কতিপয় স্বার্থান্বেষী অশুভ শক্তিরই পথ পরিষ্কার করা হবে।

**ডক্টর গৌরাঙ্গ দত্তসরকার, বাঁকুড়া**

## কার্তিক ও চুঁচুড়া

১৬ নভেমবর 'পরিবর্তনে' 'কার্তিক কি মূলত বারাঙ্গনাদের দেবতা' পড়ে আমরা হুগলী-চুঁচুড়ার অধিবাসী অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্মাহত হয়েছি।

লেখক সুধীর চক্রবর্তী উক্ত নিবন্ধের এক জায়গায় বলেছেন চুঁচুড়া শহরের একজন প্রবীণ ব্যক্তি ওঁকে নাকি বলেছেন: চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বরতলা ছাড়া আর সমস্ত জায়গায় পূর্বে বেশ্যারা থাকতো।

এ রকম অপমানকর, দায়িত্বজ্ঞানহীন, ও মিথ্যা উক্তি লেখক কি করে একজন 'কল্পিত' প্রবীণ লোকের নামে চালাতে পারলেন? লেখকের কি জানা আছে যে সমগ্র হুগলী-চুঁচুড়া

# সমীপেষু

শহরের আয়তন কমবেশি ৬ বর্গ মাইল।

একটি শহরের একটি মহল্লা বাদে (তথাকথিত ষণ্ডেশ্বরতলা) সমগ্র অঞ্চলে বেশ্যারা থাকতো—এটা কোন সমাজ-নীতিতেই সম্ভব হতে পারে না। লেখক কি এই কথাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে হুগলী-চঁচুড়ার প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তানগণ সকলে বেশ্যাসক্ত ছিল? তাহলে কি লেখকের বক্তব্যের সূত্র ধরে বলতে হবে, প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, স্যার ইউ এন ব্রহ্মচারী, অক্ষয় সরকার, দানবীর গৌরী সেন, কলকাতার লাহা পরিবারের আদি পুরুষ হৃষিকেশ লাহা, অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ভূপতি মজুমদার, গোবর্ধন শীল ও বিখ্যাত আঢ্য, মণ্ডল, পাল, সেন, দাস, ঘোষ, বোস, নন্দী, মুখারজি, ভট্টাচার্য, চট্টোপাধ্যায়, চক্রবর্তী প্রভৃতি পরিবারের ব্যক্তিরা 'বেশ্যাসক্ত' ছিল?

ইতিহাস তো কেবল মুখের কথায় হয় না। প্রমাণ ছাড়া কোন কথাই ইতিহাসে গ্রাহ্য নয়। লেখকের উক্তির স্বপক্ষে যদি কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকে তবে লেখক তাঁর এই ভ্রান্ত উক্তির জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করবেন বলে আশা করি। অন্যথায় আমাদের অন্য ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে হতে পারে।

আর এক জায়গায় লেখক, নরেন্দ্র ভট্টাচার্যর বক্তব্য প্রসঙ্গে বলেছেন যে '...কোন জায়গায় কার্তিক গণিকাদের দ্বারা পূজিত হন। এ বিষয়ে আমার জন্মস্থান চঁচুড়া শহর প্রসিদ্ধ।'

বাঃ, চমৎকার উক্তি! শ্রীভট্টাচার্য এ অনুমান কোথা থেকে করলেন? তিনি তো ইতিহাসের শিক্ষক, নিশ্চয় জানেন ইতিহাস কেবলমাত্র মুদ্রা, দলিল-দস্তাবেজ, ডাইরী, পুঁথি ও শিলালিপির উপরই নির্ভর করে। তবে কোন সঠিক প্রমাণের উপর ভিত্তি করে তিনি এরকম ভ্রান্ত ও অসংলগ্ন উক্তি করতে পারলেন? লেখকের নিশ্চয় জানা আছে, প্রায় সব শহর বা শিল্পাঞ্চলেই অল্পবিস্তর গণিকাপল্লী আছে, তবে হঠাৎ কেন হুগলী-চঁচুড়ায় অধিক গণিকাপল্লী ছিল? এ কথা কোন তথ্য থেকে তিনি পেয়েছেন অনুগ্রহ করে জানাবেন কি? এর ঐতিহাসিক সত্যতা কোথায়?

পশ্চিমবঙ্গে তো একাধিক জায়গায় একাধিক 'গণিকাপল্লী' আছে। সেখানে কেন 'কার্তিক পূজা' ধুমধামের সঙ্গে হয় না তার জবাব শ্রীভট্টাচার্য কী দেবেন? শ্রীভট্টাচার্যকে অনুরোধ করি, এ রকম ভ্রান্ত কথাবার্তা অনুগ্রহ করে যেন তাঁর পুস্তক থেকে পরের মুদ্রণে প্রত্যাহার করেন। আজে-বাজে এবং মিথ্যা উক্তি করে 'বই' লিখলেই কি পণ্ডিত হওয়া যায়? লেখক কী বলেন

কার্তিক কি মূলত বারাঙ্গনাদের দেবতা'র লেখক সুধীর চক্রবর্তী মহাশয়কে জিজ্ঞাস্য- 'কার্তিক বারাঙ্গনাদের দেবতা' এমন সঠিক প্রমাণ কি তিনি পেয়েছেন? তিনি কি জানেন খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বেও এদেশে কার্তিক পূজার প্রচলন ছিল! গুপ্তযুগের ইতিহাসে দেখা যায় যে, তাঁরা মনে করতেন (স্কন্দগুপ্ত প্রমুখ) বৃত্রাসুর বিজয়ী কার্তিকের আরাধনার ফলে হূনদের গতিরোধ হয়।

প্রখ্যাত অধ্যাপক সিলভাঁ লেভী একবার মত প্রকাশ করেছিলেন যে গ্রীকগণের বীরপূজার অনুকরণে উত্তর-পশ্চিম ভারতের জনগণ 'দেব সেনাপতির' পূজা করতে শুরু করে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রাচীন 'যৌধেয়' ও 'উদুম্বর' রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যে এই পূজা করতেন, তার প্রমাণ ভারতের নানা মুদ্রায় পাওয়া যায়। 'যৌধেয়' ও 'উদুম্বর' রাজ্যগুলিতে গণিকাদের দ্বারা কোন 'কার্তিক পূজা' হত না সেখানকার জনগণই এই পূজা করতেন। তা নাহলে অধ্যাপক সিলভাঁ লেভী নিশ্চয় মতপ্রকাশ করতেন। সাধারণভাবে অবশ্য বলতে পারি—আমরা প্রজননের ( ফারটিলিটির ) প্রয়োজনে কার্তিক পূজা করি একথা বিশ্বাসযোগ্য। অবশ্য, দেবসেনাপতির শৌর্য-বীর্যের দিকটাও স্মরণীয় এক্ষেত্রে।

তাছাড়া একথাও শ্রীচক্রবর্তীর নিশ্চয় অজানা নেই যে, আমাদের অনেক পূজাতেই 'গণিকা-বাড়ির' মাটি ছাড়া পূজা সমাপ্ত হয় না। তাহলে কি সেই সমস্ত পূজাগুলিকে 'গণিকা-বাড়ির' পূজা বলে অভিহিত করবো, শ্রীচক্রবর্তী কী বলেন?

**গণেশ নন্দী, চাঁপাতলা, চুঁচুড়া।**

**লেখকের জবাব**

পরিবর্তন ১৬ নভেমবর ১৯৮০ সংখ্যায় প্রকাশিত আমার নিবন্ধ সম্পর্কে চাঁপাতলা চুঁচুড়ানিবাসী শ্রীগণেশ নন্দী মহাশয়ের প্রতিবাদ পত্র পড়লাম। তাঁকে ধন্যবাদ। আমার লেখার মূল উদ্দেশ্য ও বক্তব্য তিনি ভুল বুঝেছেন বলে আমি দুঃখিত। হুগলী-চুঁচুড়ার কোন মানুষকে আঘাত বা অপমান করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, এখনও নেই। তবে প্রবীণ ব্যক্তিটি 'কল্পিত' নন এবং অধ্যাপক নরেন্দ্র ভট্টাচার্যের বক্তব্যটি তো তাঁর বই থেকেই উদ্ধৃত। **সুধীর চক্রবর্তী**

## নিউ থিয়েটার্স

শারদীয় 'পরিবর্তনে' নির্মল ধর মহাশয় লিখিত 'নিউ থিয়েটার্স: কিছু স্মৃতি, কয়েকটি দীর্ঘশ্বাস' প্রবন্ধে বীরেন্দ্রকুমার সরকার মহাশয়ের মুখ দিয়ে বলা হয়েছে খেলার মাঠে গ্যালারি করে দিত যে কোমপানি তার নাম 'এডওয়ার্ড' কোমপানি। আসলে সে কোমপানির নাম ছিল 'হেওয়ার্ড এনড কোমপানি।'

প্রবন্ধে আরও লেখা হয়েছে বীরেন্দ্রনাথের বাবা 'স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার জাঁদরেল মানুষ। ইংরেজদের সঙ্গে খুবই দহরম মহরম।' প্রকৃতপক্ষে স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার (Sir N. N. Sircar) ছিলেন বাংলা গভরনমেনটের এডভোকেট জেনারেল; পরে তিনি ভারত গভরনমেনটের ল' মেমবার বা আইন সচিব হয়েছিলেন।

**আনল সোম, জামসেদপুর**

## আরবে চাকরি

পরিবর্তনে প্রকাশিত, 'আরব দেশে চাকরি জোটাতে গিয়ে অনেকেই সর্বস্ব খোয়াচ্ছে' শীর্ষক রচনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৬ নভেমবর পরিবর্তনে মাকুম জংশন আসামের গোপাল ব্যানারজি এবং কেন্দা বর্ধমানের গোরাচাঁদ চক্রবর্তীর চিঠি পড়লাম। উভয় পত্রলেখকই উক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে দিল্লীর দুটি সংস্থা দ্বারা প্রবঞ্চিত হবার খবর শুনছেন। একজন শুনিয়েছেন এমন একটি সংস্থার কথা যারা আরব দেশে চাকরি জুটিয়ে দেবার নামে বেকার যুবকদের ঠকায় এবং অপরজন শুনিয়েছেন এমন correspondence institution এর কথা যারা বেকার যুবককে ডিগরি পাইয়ে দেবার নামে অন্যায়ভাবে টাকা হাতিয়ে নেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই দুই পত্র লেখকের কেউই সংস্থা দুটির নাম পরিবর্তনের পাতায় ছাপাবার জন্য লিখে পাঠাননি। তা যদি তারা করতেন তবে চাকুরি প্রত্যাশী অনেক বাঙালী যুবক অন্তত এই দুটি সংস্থার হাতে ঠকবার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত হতেন! **অর্ঘ্য দাস, বারুইপুর**

## শিব্রাম চকরবরতি

১৬ সেপটেমবর সংখ্যার 'পরিবর্তনে' চণ্ডী লাহিড়ীর শিব্রাম চক্রবর্তীর সম্বন্ধে লেখাটা পড়লাম। সরস তথ্য সম্বলিত লেখাখানা বেশ মনোগ্রাহী।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যে দুই শ্রেণীর কবি-সাহিত্যিকের অজস্রমুখ। শোষক শ্রেণীর সঙ্গে হাতে হাত রেখে এরা অপসংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে নিজেদের স্বার্থে। সমাজের নীচুতলার মানুষদের স্থান এদের সাহিত্যে নেই। শোষিতের জন্য চিন্তা মানেই রাজনীতি—এটাই তাদের যুক্তি। আরেক শ্রেণীর কবি-সাহিত্যিক আবার নানা রঙে ফেনিয়ে, নানা ঢঙে ইনিয়ে-বিনিয়ে কেবল মেয়েমানুষের কথা বলেন, নানা দৃষ্টিকোণ থেকে মেয়েদের শরীরের বর্ণনা দেন। এদের গল্প কিংবা উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা হন সুদর্শন ও যৌবনবতী। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো, বাজারে এরাই আজ Best seller। এদের ব্যক্তিগত জীবনও তাই অত্যন্ত সুখকর। তাই তো এদের সাহিত্যে থাকে না গ্রাম-বাংলার মানুষের কথা, খেটে খাওয়া মানুষের কথা, খেত-মজুরদের কথা, খনি-কারখানার শ্রমিকদের জীবনধারার কথা—তাদের সুখ-দুঃখের কথা ও সংগ্রামের কথা। এরা বুঝেও বোঝেন না যে, আজকের প্রগতিবাদের যুগে বাংলার প্রগতিবাদী সাহিত্য আজও উন্মেষের অপেক্ষায়।

তাই এত বড় বাংলা সাহিত্যে আজ মানিক ও সুকান্তের কোনো উত্তরসূরি নেই। আজো 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর মতো কোন অসাধারণ সাহিত্য-সৃষ্টি হয়নি। সৃষ্টি হয়নি 'রঙরুট' ও 'আখের স্বাদ নোনতা'-র মতো কোনো বই। আমাদের বাঙলা সাহিত্যকে যাঁরা সম্মানের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাঁদের শেষ জীবনে নেমে এসেছিল এক অভিশাপ—দারিদ্র্যরূপী অভিশাপ! এই অভিশাপে অনেকের লেখনী স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। যদি সময়োপযোগী সাহায্য এঁরা পেতেন তাহলে বাংলা সাহিত্য আরো স্বয়ম্ভর হয়ে উঠতো। যদি শিব্রাম, নজরুল, মানিক প্রভৃতি কবি-সাহিত্যিকরা সরকার কিংবা পাঠক সমাজ থেকে যথাযোগ্য সাহায্য পেতেন, তাহলে বাংলা সাহিত্য আজ অবক্ষয়ের পথে যেতে বসতো না। তাদের দারিদ্র্যের জন্যই হয়তো সকলের অজান্তে সাহিত্যের এমন একটা যুগের অবসান ঘটেছে, যে যুগ নির্ভীকতার যুগ—যে যুগ আত্মনিবেদনের যুগ—যে যুগ কালের ঊর্ধ্বে শাশ্বত সত্যানুসন্ধানের যুগ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্দেশ্যে বলবো: বাংলা সাহিত্যের রক্ষাকল্পে তাদেরও করণীয় কিছু কর্তব্য আছে। সরকারী ভাবে সাহায্য করতে হবে সেই সমস্ত বর্ষীয়ান সাহিত্যিক কিংবা কবিকে যাঁদের দৌলতে বাংলা সাহিত্য আবার হয়ে উঠবে সুস্থ সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র। বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বাঁচাতে এটাই হবে আমাদের সম্মিলিত আবেদন। **আশিসকুমার সরকার, কলকাতা ২৬**

**এবার কুড়ি টাকা সাম্মানিক পাবেন বিপ্লব বিশ্বাস।**




# অম্লমধুর

এক মাতাল মানুষ-টানা রিক্সায় গা এলিয়ে আসছে। নিজের বাড়ির দরজার কাছাকাছি আসতেই সে রিকসা-চালকের মাথার চুটকি ধরে টান দিল।

এ বাবু, কেয়া করতা ?

মাতালের জড়িতস্বরে উত্তর : ব্রেক কষতা ভাই। ব্রেক কষতা।

★

পাড়ায় ধরাপড়া চোরের পিটুনি খাওয়ার পরের উক্তি : খুব তো লম্বা লম্বা বাত মারছেন মশাই, এপাশে ঘর তো ঢু ঢু। একটা পেতল কাঁসা নেই। কোটোয় ত্রিশ পয়সা, বাক্সয় দু'টাকা। কাপড়-চোপড়ও শূন্য। গয়না-পাটিও নেই, থাকার মধ্যে রুপোর তোড়া। এদিকে আবার সোফা, স্টিল আলমারি। ঘড়টাও বাজে।

গৃহকর্তা চুপ। বেটা হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছে।

★

উর্ধ্বাংশ উন্মুক্ত কোনক্রমে সায়া ধরে এক সিনেমা নায়িকার পোসটার দেখে বাসে সহযাত্রী ভদ্রলোকের ছোট্ট মেয়ে জিজ্ঞাসা করে. বাবা মেয়েটা ওরকম আলগা গায়ে কেন ?

বাবা আমার প্রতি : বলুন তো কি উত্তর দিই। দেশটা—

উত্তর মেয়েই দেয় : ও বুঝেছি, বাথরুমে যাবে। না, বাবা ?

★

পরেশবাবু বললেন, আমার ভাড়াটে তুলেছি মশাই। উঃ তুলতে কী ঝগড়া-ঝাটি মামলা কিছুতেই পারিনি, কম হেপা ?

তা তুললেন কিসে ?

ভাড়াটের.ছোট মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলে, যাকে বলে ইয়ে, মানে রেজিসট্রি করে বিয়ে করে এনেছে। মেয়ে এসে সাতদিন টাইম দিয়েছিল বাবাকে। তিনদিনেই সরে পড়েছে ভাড়াটে।

অশোককুমার সেনগুপ্ত

★

পণ্ডিতেরা বলেন যাহা
সেটাইতো নয় গ্রাহ্য
বিশেষজ্ঞের মতামতটা
হতেও পারে ত্যাজ্য ;
কিন্তু পার্টির নেতার কথা
হবেই হবে ন্যায্য !

প্রসঙ্গ : সহজ পাঠ

★

রেশনের দ্রব্যের
লীলা বোঝা ভার
এই আছে, এই নেই
নিত্য খেলা তার ;
হঠাৎ যদি কোনদিন
সব দ্রব্য পান
জানবেন—বৃহস্পতি
তুঙ্গে বর্তমান।

প্রিয়রঞ্জন মৈত্র

★

জ্যামে তখন আটকে গেছে গাড়ি :
রসিক ছোকরা বাসের থেকে বলে হেঁকে—
'এই যে দাদা ছিপি ( C P )
বোতল কোথা এলেন রেখে ?'
ট্রাফিক দাদা বলেন হেসে
এই তো পাশেই আছে—
তাকিয়ে দেখি দাঁড়িয়ে কাছে
'H G' এক ষণ্ডা,
তস্য অর্থ : হেওয়ার্ডস গোলকুণ্ডা ! ?

শ্যামলকুমার চক্রবর্তী

# মিলিটারি স্টোরে চুরি এবং লাজারের মৃত্যু রহস্য

সুদীপ মজুমদার

সারা দেশ যখন ভাগলপুরে বিচারাধীন বন্দীদের অন্ধ করে দেবার প্রতিবাদে মুখর প্রায় সেই সময়ই পারলামেনট ও লোকচক্ষুর অন্তরালে আর একটা তথাকথিত ভয়ঙ্কর অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছিল। ভাগলপুরের ঘটনার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছে পুলিশ আর কিছু সরকারী বড়কর্তা। কিন্তু যে ঘটনা ঘটেছে খোদ দিললির বিশাল মিলিটারি ক্যানটনমেনটে তার দোষী এখনও ধরা পড়েনি। লোকসভায় এই বিষয়ের ওপরে দুবার ওয়াক আউট হয়ে গেছে। স্বয়ং স্পীকার বলেছেন তিনি খোঁজ-খবর নিয়ে দেখবেন। তবুও উত্তেজনার প্রশমন হয়নি। বরং তা বেড়েই চলেছে, বিশেষত সুদূর কেরালায়।

শেষ থেকে শুরু করা যাক। শেষ হল ২৮৮ নমবর 'ডিফেনস সিকিউরিটি কোর' (DSC) এর জওয়ান কুঞ্জন লাজারের জীবনের। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে ও মারা গেল গত ১৮ নভেমবর দিললি ক্যানটনমেনটে। আর সেখান থেকেই শুরু হল উত্তেজনা আর চাপাচাপির অদম্য প্রয়াস। আরমি অফিসাররা বলে চলেছেন—লাজারের 'স্বাভাবিক মৃত্যু' হয়েছে। কিন্তু ওর বন্ধু বান্ধব আর এমন কি পুলিশ মহল মনে করে—'না, ওকে টরচার করে মেরে ফেলা হয়েছে।'

দিললি ক্যানটনমেনট শহর থেকে পালাম বিমান বন্দরে যাবার রাস্তার ডানদিকে বিরাট অঞ্চল জুড়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ছাউনি অবস্থিত। এখানে ফায়ারিং রেঞ্জ থেকে আরম্ভ করে বড় বড় মিলিটারি স্টোরও আছে। এমনই এক মিলিটারি স্টোরের নাম সেন্ট্রাল অরডন্যানস ডিপো (Central Ordnance Depot বা COD)। এই ডিপোতে প্রচুর দামী দামী জিনিসপত্র স্টোর করে রাখা হয়। সারা দেশে এরকম বড় ডিপো সেনাবাহিনীর সাতটি ছাউনিতে আছে। এগুলোতে মিলিটারি গাড়ি শক্তিমান ও নিশান-এর যন্ত্রপাতি, ফুয়েল পাম্প, ব্যাটারী ইত্যাদি রাখা থাকে। তাছাড়া থাকে ট্যাঙ্কের কলকব্জা থেকে আরম্ভ করে আরও অনেক দামী যন্ত্রপাতি। যেমন যেমন দরকার পড়ে তেমন তেমন মাল ইস্যু করা হয়।

এই ডিপোর চারপাশে প্রায় ১৫ ফিট উঁচু খাড়া দেওয়াল। তার ওপরে আবার তার কাঁটার বেড়া। তাছাড়া চারটি ওয়াচ-টাওয়ারের উপর অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে ২৪ ঘণ্টা ডি এস সির জওয়ানরা পাহারা দিচ্ছে। এমনিতেই মিলিটারির ব্যাপার-স্যাপারে একটু বিশেষ রকমের প্রহরা থাকে। যেমন থাকে ফোরট উইলিয়ামের ভেতর। সেখানে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ান যায় না। সতর্ক দৃষ্টি সব সময় সজাগ। দামী কলকব্জা—যন্ত্রপাতির ভাঁড়ারে তো আরও বিশেষ প্রহরা।

কিন্তু এক উচ্চপদস্থ আরমি অফিসারের বক্তব্য অনুযায়ী গত ১৫-২০ বছর ধরে এক-নাগাড়ে এই ডিপো থেকে মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি যাচ্ছে। হাজার হাজার টাকার মাল লোপাট হয়ে যাচ্ছে প্রতিবছর। আপাত দৃষ্টিতে চোর কখনো ধরা পড়ে না। ১৯৮০ সালেই বড় দুটো চুরি হয় ডিপো থেকে। প্রথমটা ঘটে ১৯ জানুয়ারির রাতে। মাল লোপাট হয় সাড়ে তিন লাখ টাকার মত। দ্বিতীয় চুরি হয় সেপটেমবর মাস নাগাদ। দ্বিতীয় বারে চুরি যায় প্রায় দেড় লাখ টাকার মত দামী দরকারী যন্ত্রপাতি। তারপরেও 'চুরি' হতে চলেছিল নভেমবর ১৫-১৬ নাগাদ। আর সেখান থেকেই আজকের কাহিনী শুরু।

জওয়ানরা বাড়ি ঘর ছেড়ে বহুদূরে ক্যানটনমেনটে থাকেন; তাই তাদের মনোরঞ্জনের জন্য কোথাও কোথাও সিনেমা দেখানর চল আছে। তেমনি এক মুক্তাঙ্গনে সিনেমা দেখান হচ্ছিল ১৫ নভেমবর সন্ধ্যেবেলা। হিন্দি ছবি। তখন রাত প্রায় সাড়ে সাতটা। হঠাৎ সিনেমা বন্ধ হয়ে গিয়ে মাইকে ঘোষণা হল অমুক প্যাটুনের জওয়ানরা তাড়াতাড়ি লাইনে দাঁড়াও। সঙ্গে সঙ্গে কিছু জওয়ান হল ছেড়ে বাইরে চলে গেলেন। তাদের মধ্যে বেছে বেছে কিছু জওয়ানকে গোলাবন্দুক দিয়ে বলা হল তৈরি থাকতে। আজ রাতে বিশেষ কাজে যেতে হবে। ততক্ষণে শীতের রাতে পুরো ক্যানটনমেনট এলাকায় নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। বড় বড় গাছ দিয়ে ঢাকা রাস্তাগুলো প্রায় ফাঁকা। কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। ডিপোয় তখন শীতল নির্জনতা।

সিনেমা শেষ হয়ে যাবার পরে জওয়ানরা যে যার ব্যারাকে ফিরে যায়। পরদিন সকালে ক্যানটিনে গুঞ্জন ওঠে কাল রাতে কিছু সিভিলিয়ান আর জওয়ান ধরা পড়েছে চুরির অপরাধে।

তারপর দিন তিনেক কোনও বিশেষ আলোচনা হয়নি এ বিষয়ে। আবার ১৯ নভেমবর ডিপো আর DSC-এর জওয়ানদের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে। এবার খবর এসেছে—সেদিন রাতে যারা ধরা পড়েছিল তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আরও কিছু লোকের নাম পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে ছিল সিপাহী কুঞ্জন লাজার আর সিপাহী কে কে শশী। কুঞ্জন লাজার আর শশীকে আগের রাতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরদিন সকালে লাজারের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে জওয়ানদের ব্যারাকে। শশীও নাকি খুবই আহত অবস্থায় মিলিটারি জেলে পড়ে কাতরাচ্ছে। পরদিন অর্থাৎ ২০ নভেমবর সূর্য অস্ত যাচ্ছে। এমন সময় ক্যানটনমেনট সিমেট্রিতে লাজারকে কবরও দিয়ে দেওয়া হয়। ও ছিল কেরালার খ্রিশ্চান।

আবার দশটা দিন কেটে যায়। কর্তারা বোধহয় ভেবেছিলেন—সব চাপা পড়ে গেছে। কিন্তু জওয়ানদের মধ্যে উত্তেজনা বরাবরই বহাল ছিল। হঠাৎ সেই উত্তেজনার খবর বেরিয়ে পড়ে বাইরে আর সোজা পৌঁছে যায় এক খবরের কাগজের অফিসে। ২৯ নভেমবর যখন ইনডিয়ান একসপ্রেসে লাজারের মৃত্যু সংক্রান্ত খবরটা ফলাও করে বেরোলো তখন চারদিক থেকে প্রশ্ন উঠল—মিলিটারির মধ্যেও কি পুলিশের মত বর্বরতা রয়েছে? লাজার যদি চুরি করেই থাকে তবে ওকে পর্যাপ্ত সাজা দেওয়া যেত; কিন্তু কোনও জওয়ানকে পিটিয়ে মারার অধিকার কারো নেই।

ইনডিয়ান একসপ্রেস ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ডিটেল দিয়ে লাজারের মৃত্যু রহস্য ফাঁস করে দেয়। ১৮ নভেমবর রাত্রিতে যে 'জিজ্ঞাসাবাদ' চলছিল তার কিছু সাক্ষীর জবানীও জানতে পারা যায়। সেই জবানীর কাহিনী রোমহর্ষক।

তখন রাত প্রায় ৯টা। খাওয়া-দাওয়া সেরে জওয়ানরা সব যে যার ব্যারাকে ফিরে গেছে। কিন্তু COD বা কড-এর কিছু কর্মকর্তাদের চোখে ঘুম নেই। একটা বড়সড় অফিস ঘরকে এমন ভাবে সাজান হোল যাকে হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন কোনও একটা পুলিশ স্টেশন। ওর ভেতরে তিনজন লোক বসেছিল। সবার পরণে সাদা পোশাক। মুখগুলো কাপড়ে ঢাকা। যাতে কেউ চিনতে না পারে। বাইরে দাঁড়িয়েছিল একটা নিশান ট্রাক। তার পেছনটা ঢাকা। পুরো অঞ্চলটা পাহারা দেবার জন্য সে সময় প্রায় ছ'জন জওয়ান ছিল ডিউটিতে। নিশান ট্রাকখানা আস্তে আস্তে COD-এর কোয়ার্টার গার্ড (যার মানে হোল মিলিটারি জেল) এর দিকে রওনা হোল। সেখান থেকে একজন বন্দীকে তুলে আনা হোল চোখে কাপড় বেঁধে। বন্দীর নাম কে কে শশী। যে তথাকথিত চুরির অপরাধে ধরা পড়েছিল। হাত পেছনে বাঁধা। কয়েকটা পাক দিয়ে নিশান ট্রাক এসে

দাঁড়াল কামরার সামনে। শশীকে ধরে নিয়ে যাওয়া হোল ভেতরে। সেখানে ওর ওপরে হোল বেদম প্রহার। লাঠি আর বাঁটের গুঁতো খেয়ে শশী প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ওকে তুলে ফেরত নিয়ে যাওয়া হয় জেলে। আনা হয় আর এক বন্দীকে। এর নাম পদ্মস্বামী। কয়েকবার মারার পরেই ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ওকেও ফেরত নিয়ে যাওয়া হয় জেলে। এবার আনা হয় লাজারকে। চমৎকার চেহারা। চারটে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের বাপ। সুদূর কেরালায় তারা থাকে মা রুক্মিনী আর লাজারের বৃদ্ধ বাবার কাছে। গরিব পরিবার।

লাজারের চোখে পট্টি। হাত বাঁধা। সেই অবস্থায় ওকে কামরার ভেতরে ঠেলে ঢোকান হয়। শুরু হয় মার। প্রথম প্রথম দাঁড়িয়ে ছিল ও। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মাটিতে পড়ে যায়। তখন ওকে তুলে সামনে দাঁড়ান নিশান ট্রাকে করে ফেরত পাঠান হচ্ছিল। জোর করে দাঁড় করানর পরই ও আহত অবস্থায় মুখ থুবড়ে শক্ত বাঁধানো বারান্দায় পড়ে যায়। মোটা মোটা লাঠি, বাঁট আর জুতো দিয়ে আবার প্রহার। 'ব্যাটা ন্যাকামি হচ্ছে'। মুখে গালাগালি। লাজার কাতরে ওঠে, 'আমাকে এরা মেরে ফেলল। আমার বাচ্চা আর বৌ-এর কি হবে।' এমন সময় এক নারসিং অর্ডারলিকে ডাকা হোল। বেহুঁশ হয়ে পড়েছে বলে ওর বুকে চাপ দিয়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাস করানর চেষ্টা করা হোল। কিন্তু বদলে মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। সঙ্গে কয়েকটা ভাতের দানা। রাত্রের খাবার। ওকে তুলে জেলের সেলে শুইয়ে দেওয়া হোল কম্বল ঢাকা দিয়ে। সব শেষ হয়ে গেল রাত প্রায় দেড়টার মধ্যে। কিন্তু ওর অবস্থা দেখে COD-র কয়েকজন লোক ভাবল বড়কর্তাদের খবর দেওয়া দরকার। বড়কর্তারা এসে পৌঁছলেন তাড়াতাড়ি। কী সব কানাঘুষো হোল।

শেষ পর্যন্ত ভোর চারটে পনেরো মিনিটে ওকে মিলিটারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হোল। সেখানে ডাক্তার দেখেই বলল ও তো মারা গেছে অনেকক্ষণ হোল। শব হাসপাতালে ভর্তি করানর কোনও মানে হয় না। কিন্তু ওদের ফিরিয়ে দেবার আগে সন্দিগ্ধ ডাক্তার লাজারের শরীরের কয়েকটা অংশ একস-রে করিয়ে রেখে দিল। দেখা গেল ওর পা ভাঙা। ডাক্তার পুলিশকেও খবর দিয়ে দিল। পুলিশ এসে লাশ নিয়ে চলে গেল। সেদিন অল ইনডিয়া ইনসটিট্যুট অব মেডিক্যাল সায়েনসে পোসট মরটেম হোল। তারপর ক্যানটনমেনট সেমেট্রিতে ওকে কবরও দিয়ে দেওয়া হোল।

কবরে মাটি চাপা পড়েগেল কিন্তু পোসট-মরটেম রিপোরট মাটি চাপা পড়ল না। কি করে ওটা খবরের কাগজের হাতে এসে গেল। যদিও C.O.D-এর অফিসাররা লাজারের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে বলে ওকে কবর দিয়ে দিয়েছিল কিন্তু, পোসটমরটেম রিপোরটে দেখা গেল যে ওর শরীরে অন্তত বারোটা বড়বড় আঘাত ছিল। তার মধ্যে লিভারের একটা অংশ ছিঁড়ে যাওয়া, ফুসফুসে আঘাত, শরীরের অনেক জায়গায় শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত করলে যেমন ক্ষত হয় তা, এবং সর্বোপরি abdominal cavity-তে প্রায় ৯০০ মিলিলিটার রক্ত জমা হয়েছিল।

খবর ছাপার দুদিন পরে ডিফেনস মিনিসট্রির সাউথ ব্লকে স্বয়ং এস এস সন্ধু সাংবাদিকদের ডাকলেন মিলিটারির পক্ষ থেকে পুরো ব্যাপারটা বলতে। লেফটেন্যানট জেনারেল সন্ধু হচ্ছেন অরডন্যানস সারভিসেসের ডাইরেকটর। তিনি বললেন লাজারের মৃত্যু ও এতদিন ধরে যে চুরি হয়ে আসছিল তার জন্য এক কোরট অব ইনকোয়ারী বসান হয়েছে। যা কিছু কাগজে বেরিয়েছে তার সোজা প্রতিবাদ তিনি করলেন না; কিন্তু বললেন—'আমরা এতদিন পরে একটা বড় গ্যাংকে ধরতে পেরেছি। এরা এতদিন ধরে মাল পাচার করে যাচ্ছিল।'

কি করে একেবারে নিম্নপদস্থ জওয়ানরা এতবড় চুরি করে বড় অফিসারদের সাহায্য ছাড়া? জেনারেল সন্ধু বললেন—'কোরট অব ইনকোয়ারিতে এসবের হদিশ পাওয়া যাবে।' তিনি চুরির আরও বিস্তৃত হিসেব নিকেশ দেখাতে লাগলেন। কিন্তু প্রশ্ন রয়ে গেল, মিলিটারির নাকের তলা দিয়ে এতবছর ধরে এত চুরি হয়ে যাচ্ছিল আর কেউ ধরা পড়ছিল না? আর ধরা পড়ল তো মাত্র কয়েকটা নিম্নপদস্থ সেপাই। এত নজর এড়িয়ে কি করে এরা এত মাল পাচার করে দিল? ডিপোর চারদিকে এত উঁচু দেওয়াল, তার ওপর তারকাঁটা। ওর ওপর দিয়ে ভারী ভারী মাল পাচার হয় কি করে? আর সবচেয়ে বড় কথা লাজারের যদি স্বাভাবিক মৃত্যু হয়ে থাকে তবে কোরট অব ইনকোয়ারির কি দরকার?

এই প্রশ্নগুলো এত বেশি ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল সংসদ সদস্য নীললোহিত দাস নাদারকে যে তিনি একদিন লোকসভা চলাকালে স্পীকারকে আবেদন জানান এক পারলামেনটারী কমিটি দ্বারা পুরো ব্যাপারটা অনুসন্ধান করার জন্য। শ্রীনাদার ত্রিবান্দ্রম অঞ্চলের এম পি। তারই এলাকায় লাজারের বাড়ি। ঘটনা ঘটার কয়েকদিন পরে শ্রীনাদার একদিন এক মিটিংয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন কেরালায়। হঠাৎ কেউ বলে যে লাজারের বিধবা স্ত্রী রুক্মিণী তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

লাজার মারা যাওয়ার ১০ দিন পরেও রুক্মিণীকে কেউ খবরটা দেয়নি। সংসারের অবস্থা দেখে শ্রীনাদার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে একটা চিঠি লেখেন আর অনুরোধ করেন লাজারের পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব যেন সরকার নেন আর ওর মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটন করতে তদন্তের ব্যবস্থা করেন।

শ্রীনাদার কোনও উত্তর পাননি বেশ কয়েকদিন। ফলে উত্তেজিত হয়ে ১১ ডিসেমবর তিনি লোকসভায় এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তিনি স্পীকারকে খবরের কাগজের রিপোরট দেখিয়ে বলেন দোষী অফিসারদের এখনই সাসপেণ্ড করা দরকার আর ইনকোয়ারীও হওয়া দরকার। জ্যোতির্ময় বসু সমেত অন্যান্য এম পি-ও স্পীকারকে বলেন ওর কথা শুনতে। কিন্তু উত্তেজিত হয়ে শ্রীনাদার ও আর কয়েকজন মন্ত্রী ওয়াক-আউট করেন। তার কিছুদিন পরে আর একজন এম পি শ্রীকুলকার্ণী আবার ওয়াক-আউট করেন এই প্রসঙ্গ নিয়ে।

ইতিমধ্যে দিললি পুলিস তাদের নিজেদের অনুসন্ধান শুরু করে দেয় এবং লাজার-এর মৃত্যুকে নিয়ে একটা কেস রেজিসটার করা হয় Sections 304 এবং 331— এর অধীনে। পুলিশী সূত্রের খবর—অনুসন্ধান করার কাজে নানান ধরনের চাপ আসছে যাতে সত্য ঠিকমত উদ্ঘাটিত না হয়। এক উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার বললেন—C.O.D থেকে গত বছরের ওই বড়বড় দুটো চুরির মামলা Crime Branch আর C.B I - এর হাতে রয়েছে। তিনি মনে করেন—এ ধরনের চুরিতে ওপরতলার হাত না থাকলে চুরি করা প্রায় অসম্ভব। দিললির জামা মসজিদ এলাকার মহম্মদ ওসমান বলে এক পুরনো যন্ত্রপাতির ব্যবসায়ীকে এই মামলায় ধরা হয়েছে। ও নাকি স্বীকার করেছে—ডিপো থেকে যে মাল চুরি হোত তা ওর হাত দিয়ে বাইরে পাচার ও বিক্রি হোত। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে অনেক। যেমন যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম কেনার মত ক্ষমতা বা ইচ্ছা বা দরকার বাজারে ক'জনের আছে? গাড়ির যন্ত্রপাতি না হয় চোরাবাজারে বিক্রি হবে, কিন্তু ট্যাঙ্কের পারটস? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হোল—লাজার যদি সত্যসত্যই অপরাধ করে থাকে ওকে আইন মাফিক শাস্তি দেওয়া হোল না কেন? নাকি সবটাই মৃত লাজারের ওপর সব দোষ চাপিয়ে আরও বড় কোনও চুরির ঢাকার প্রয়াস? সব চাইতে বড় সুবিধা—মৃতেরা কথা বলে না। □



সতী মিছিল। হিন্দুস্থান টাইমসে প্রকাশিত ফটো

# সতী-পূজা ঃ ভারতের মেয়েরা কি আবার পিছনে হাঁটছেন ?

• প্রণতি দেবনাথ

আটশো বছর আগের কথা। রাজস্থানের ঝুনঝুনু রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর হাতে নিহত হলেন। মৃতদেহ চিতায় চড়ানো হল ; ছুটে এলেন রানী। বললেন—আমিও ওঁর সঙ্গে যাবো ; জীবনে মরণে আমাদের একই গতি হোক। ওঁকে ছেড়ে আমি একদিনও বেঁচে থাকতে পারবো না।

মৃত স্বামীর দেহ জড়িয়ে ধরে ঝুনঝুনুর রানী চলে গেলেন মৃত্যু পরপারে ; কিন্তু তিনি বেঁচে রইলেন লোকের স্মৃতিতে। রাজস্থানের মানুষ তাকে ভোলেনি. তারই স্মৃতিতে গড়ে তুলেছে সতী মন্দির। প্রতি বছর মন্দিরের সামনে মেলা বসে ; হাজার হাজার নারী সতীরানীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে হাজির হয় সেই মেলায়।

সেই রানীকে নিয়ে মাস খানেক আগে দিল্লিতে প্রায় তুলকালাম কাণ্ড হয়ে গেল। শ'খানেক মহিলা সুন্দর 'লেংগা' আর লাল উজ্জ্বল 'চুনী' পরে, গয়নাগাটিতে একেবারে নববধূর মত সাজগোজ করে, দিল্লির রাস্তায় মিছিল বের করেছিল। ওদের মাথায় ছিল মঙ্গল কলস। ওরা সবাই এসেছিল 'রানীসতী সর্বসঙ্ঘের' উদ্যোগে আয়োজিত মিছিলে যোগ দিতে। প্রথমে সবাই সমবেত হয় প্যারেড গ্রাউনডে। দিল্লিতে রাজস্থানের সেই সতীরানীর পুণ্য স্মৃতিতে একটি মন্দির গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তারই উদ্যোগ পর্ব হিসাবে ওই মিছিল।

কাজটা কিন্তু নির্বিঘ্নে হল না। ওরা যখন পূজা সুরু করেছে তখনই কারা যেন প্রতিবাদে ফেটে পড়ল। ১৯৮০ সালে এসব কী কাণ্ড! প্রতিবাদিনীরা ধ্বনি তুললেন—'সতীপ্রথা পাপ হ্যায়'।

সতী মন্দির নিয়ে মিছিল বেরুবে ; দিল্লির চাঁদনীচকে রাজস্থানের সতীর স্মৃতিতে মন্দির গড়া হবে—এসব কথা দিল্লিতে আগেই চাউর হয়ে গিয়েছিল। ইনডিয়ান হাউস-ওয়াইভস ফেডারেশন দাবি তুলেছিল—আজকের দিনে খোদ রাজধানীর বুকে এ ধরনের মিছিল বের করতে দেওয়াই অন্যায়, এটা বন্ধ করা হোক।

মিছিল অবশ্য বন্ধ হয়নি। তবে তা পূর্ব নির্ধারিত সময়ে বের হতে পারেনি। এগারোটার জায়গায় মিছিল বেরিয়েছিল আড়াইটার সময়, গন্তব্যে পৌছেছিল পাঁচটায়। পথের দু'ধারের বাড়িগুলি থেকে মিছিলের ওপর করা হয়েছিল পুষ্পবৃষ্টি।

মিছিল বের হতে দেরি হওয়ার কারণ বিক্ষোভ। ইনডিয়ান হাউস ওয়াইভস ফেডারেশন, স্ত্রী সংঘর্ষ সমিতি, কংগ্রেস (আই) এর নারীশাখার লিগ্যাল এড সেল, 'ন্যাশনাল ফেডারেশন অব ইনডিয়ান উইমেন' প্রভৃতি বিভিন্ন নারী সংগঠনের সদস্যারা সমবেত ভাবে সতী মিছিল রোধ করার চেষ্টা করেন। ওদের মতে—কয়েক শ'বছর আগে যে নারী স্বামীর চিতায় জীবন্ত দগ্ধ হয়েছিলেন তার স্মৃতিতে মন্দির গড়া বা সে উপলক্ষে মিছিল বের করা—এসব কিছুই আসলে সতীদাহ প্রথাকে নতুন করে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা মাত্র।

তাই ওরা সর্বশক্তি দিয়ে মিছিল বন্ধ করার চেষ্টা করেন। মৌখিক প্রতিবাদে কাজ না হওয়ায় নারী সংগঠনের সদস্যারা সতী মিছিলের সামনে বাধার প্রাচীর সৃষ্টিরও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ওঁরা সংখ্যায় ছিলেন নেহাৎই নগণ্য—মাত্র জনদশেক। স্বভাবতই প্রায় পনেরো গুণ বেশি মিছিলকারিণীদের ওঁরা শেষ পর্যন্ত আটকিয়ে রাখতে পারেননি। একটু হুড়োহুড়ি হয়েছে, এই পর্যন্ত। কাছাকাছি পুলিশও ছিল, কিন্তু দু'দল নারীর গুঁতোগুঁতিতে তারা মাথা গলায়নি। পরে এই নিয়ে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে কংগ্রেস আই-এর 'লিগ্যাল সেল ফর উইমেনের' তরফ থেকে প্রতিবাদও জানানো হয়েছিল।

'রানী সতী সর্বসঙ্ঘ' নাকি একসময়ে মিছিল বের করবে না বলেই ঠিক করেছিল। কিন্তু বিভিন্ন নারী সংগঠন মিছিলে বাধা দেবে বলে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায় সঙ্ঘেরও জেদ চেপে যায় ; তারা মিছিল বের করে এবং গন্তব্যেও গিয়ে পৌছায়।

সঙ্ঘের তরফ থেকে আমন্ত্রণপত্রও বিলি করা হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল—রেলমন্ত্রী কেদার পাণ্ডে এবং সংসদ সদস্য এইচ কে এল ভগত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকবেন। কিন্তু গণ্ডগোল হতে পারে বলে পুলিশের তরফ থেকে সতর্ক করে দেওয়ায় ওঁরা শেষ পর্যন্ত আর হাজির হননি।

সতী মিছিলের প্রসঙ্গ লোকসভাতেও উঠেছিল। জনতা দলের সদস্যা প্রমীলা দণ্ডবতে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে বলেন—একদল লোক সতীপ্রথাকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছে। গত কয়েক মাসে দেশের নানা জায়গা থেকে সতী হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে, অথচ কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। এধরনের ঘৃণ্য প্রথা তিনি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার দাবি জানান।

পরে শ্রীমতী দণ্ডবতে, শ্রীমতী গীতা মুখারজি এবং শ্রীমতী হামিদা হাবিবুল্লা সমেত কয়েকজন এম পি এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। ওঁরা বলেন—এই অবৈধ ও পশ্চাদমুখী প্রথা নারীর বেঁচে থাকার অধিকারকেই কেড়ে নেবে ; সুতরাং এটা এখুনিই বন্ধ করা হোক।

সঙ্ঘের উদ্যোক্তারা অবশ্য বলেছেন—তারা সতীপ্রথা ফিরিয়ে আনতে চান না, কিন্তু যাঁরা একসময়ে সতী হয়েছেন তাঁদের পুজো করতে চান। চাঁদনীচকে সতী মন্দির গড়ার জন্য আট লাখ টাকা দিয়ে একটা জায়গাও কেনা হয়েছে। সেখানে এখন আছে একটা পুরনো বাড়ি। ওই বাড়ি ভেঙে ফেলে মন্দির গড়া হবে।

সংস্কারের সঙ্গে আধুনিকতার লড়াইয়ে প্রথম রাউনডে সংস্কারেরই জয় হয়েছে। কিন্তু এই জয় আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে—সামনে, না পিছনে ? □

# নিবারণ চক্রবর্তীর বঙ্গদর্পণ

অঘ্রাণের বিকেল ম্লান হয়ে উঠেছে। রেড রোড দিয়ে সাঁইসাঁই করে গাড়ি ছুটছে। সুশান্তর তাড়াতাড়ি নেই। স্টিয়ারিং আলতোভাবে ধরে ধীরেসুস্থে গাড়ি চালাচ্ছে। অমল নিজের সিগারেট ধরিয়ে বন্ধুর ঠোঁটে-গোঁজা পাইপে আরেকবার অগ্নিসংযোগ করে দিল। সুশান্ত ইংরাজিতে ধন্যবাদ জানিয়ে অপসৃয়মাণ গাড়ির ঝাঁক আর বিকেলের ম্লান আলো অলস চোখে একবার দেখে নিয়ে অমলকে নিদারুণভাবে চমকে দিয়ে হঠাৎ বলল, 'কিরে শালা অম্‌লা, কেমন আছিস? বৌকে পুরোনো লাগতে আরম্ভ করেছে?'

অমলের মনে পড়লো সিঁদুরের টিপ পরা স্নিগ্ধ প্রতীক্ষাতুর এক মুখশ্রী। রুনা। তার বউ। পনেরো বছরের জীবন সঙ্গিনী। এই মুহূর্তে হয়ত মেয়েকে পড়াচ্ছে আর উল বুনছে চন্দননগরের উর্দিবাজারের বাড়ির ছাদে। সামনে গঙ্গা। আজকে অমলের বাড়ি ফেরা হবেনা। ভোরে আসবার সময় রুনাকে সারাদিনের রুটিন বুঝিয়ে দিয়ে এসেছে ('সময়মত ভাত খাবে' 'আপেলটা নষ্ট কোরো না' 'বিকেলে স্ট্র্যাণ্ডে একটু পায়চারি করবে মেয়েকে নিয়ে' 'কেউ খোঁজ করতে এলে ফস করে যেন বলে বোসো না যে আজ ফিরবো না, এখনকার দিনকাল ভাল নয়')। সব শুনে রুনা জবাব দিয়েছে, 'তুমি না থাকলে খুব কষ্ট হয়, আমি টিকতে পারিনা একদম'।

সুশান্ত পাইপের ধোঁয়া ছাড়ছে আর আপনমনে বিড় বিড় করছে: 'আমার বউ এখন তার বান্ধবীর সঙ্গে শপিং করছে আর আমি শালা এখন চুল্লু চারজ করে পরনো কুটিরে যাব। বুঝলি কিছু ব্যাটা শুকদেব?'

অমল বলল, 'পরনো কুটির মানে?'

: 'মানে আমার কনটিনেনট থেকে সদ্যপ্রত্যাগত বন্ধুবর শ্রীমান সৌগত সেনশর্মার বাড়ি। কি, চোখ কপালে তুললি কেন? ভাবছিস সৌগতর লেকটেরাসের অতবড় বাড়িটা পর্ণকুটির কি করে হল? কাম অন ফ্রেনড। মারক দ্য স্পেলিং, পর্ণ নয় পরনো। আজ্ঞে হ্যাঁ একটুখানি পাতার আবরণও নেই। বিশুদ্ধ পরনোগ্রাফি আর পরনো ট্রানসপ্যারেনসিতে ঘর ভরিয়েছে সৌ দ্য লাকি চ্যাপ। রাত দশটা পর্যন্ত ওখানেই কাটে আজকাল

: 'কেন? সুকম্পাকে তোর ভাল লাগে না আর? বাচ্চা দু'টোকে একটু কোমপানী দিস না?'

: 'ধুস, ওসব সুকম্পা টুকম্পা কি রকম জানিস? সেই স্টুডেনট লাইফে সিঙ্গাড়া চা খাওয়ার মত। তুই এখন ভাবতে পারিস বিকেলে সিঙ্গাড়া চা খাচ্ছিস? আমাদের ব্যাপার কি জানিস? যেই সূর্যের তেজ কমে গেল অমনি গরম চা কফি অচল: তখন শুধু চুল্লু আর ট্যাবলেট। আর হ্যাঁ, কি একটা হাসির কথা বললি. যেন? বাচ্চাদের কোমপানী দেওয়া? বাচ্চাদের কোমপানী দেয় মাসি-পিসিরা। সৌগত কি বলে জানিস? বলে আমাদের বাচ্চারা সব ওভারটাইমের। শালা। তুই মুখ ঘোরাচ্ছিস কেন? কলেজে পেঁপে চুরি করে করে সব তোরা পেঁপেসার হয়ে গেছিস। এটা শালা সৌগত বলে। তোর কথা উঠলে বলে গরমেনট কলেজের পেঁপেসার। একেবারে পেঁপের মত সারবান। সমাজের পক্ষে বড় উপকারী। কি সব বলিস যেন তোরা? মূল্যবোধ, শুভবুদ্ধি, নিরীক্ষা, অভিষ্ট, প্রত্যয়, ভবিষ্য, অতলান্ত। সত্যিই বাংলা ভাষাটা একেবারে হিজড়ের মত। না সংস্কৃত না বাংলা। শালা এ ভাষায় খিস্তি করেও সুখ নেই।'

নৈহাটির বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে চল্লিশ বছর আগে জন্মেছিল এক দিব্যকান্তি শিশু। আদর্শবাদী শিক্ষক পিতা তার নাম রেখেছিলেন সুশান্তকুমার। জন্ম মাত্র সুতীব্র চীৎকারেই হয়ত শিশুটি প্রতিবাদ করেছিল। এখন চল্লিশ বছরের সুশানট গ্যাংগুলি তার মেধাবী কৃতিত্বসমুজ্জ্বল ছাত্রজীবনের এক অপরূপ ব্যঙ্গচিত্র। অমলকান্তি কি করে ভুলবে যে ইংরাজি ও সংস্কৃতে লেটার পাওয়া এই ছেলে হুগলী মহসিন কলেজে তাকে কোনদিন অদ্বিতীয় হতে দেয়নি? ইংরাজিতে প্রথম শ্রেণী পেয়ে অমলকান্তি যখন স্বনির্বাচিত পেশা অধ্যাপনায় এল তখন একই ফলাফল করে সুশান্ত গেল কমারশিয়াল ফারমে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মারকিনী কালচার, কাঁচা পয়সার বেওসা, দুনম্বরী রোজগার, দেশভাগের বিদ্রূপ আর মদ্যসংস্কৃতি কখন চোরা পথে চুপিসারে কীভাবে সুশান্তদের অশান্ত করে দিয়েছে কে জানে? মূল্যবোধ শুভবুদ্ধি প্রত্যয়-জাতীয় শব্দগুলির সঙ্গে মনুষ্যত্ব কর্তব্য মাত্রাবোধ কখন ঘষা পয়সার মত অচল হয়ে গেল তা কেউ ভাবে?

আর ভালবাসাটা! সুশান্তর জীবনে সুকম্পার মতই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। সুখী গৃহকোণে তেরছাভাবে ফোকাস ফেলছে পরনো বিলাস। অমলকান্তি কেমন করে ভুলবে যে, সুকম্পাকে ভালবেসে সুশান্ত বিয়ে করেছিল। ম্যারেজ রেজিসটারের সামনে সেদিন সুশান্তর হাত যতখানি কেঁপেছিল উত্তেজনা ও উদ্বেগে আজকে সেই হাত তার চেয়ে দ্বিগুণ কাঁপে মাদক আর স্নায়বিক অবসাদে। চা সিঙ্গাড়া থেকে চুল্লু ট্যাবলেট।

অমলও রুনাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিল। তাদের ভালবাসা আছে তবে নিজেদের মত একটা ভাল বাসা আজও জোটেনি। এই দুঃখ আছে। এখন আসন্ন সন্ধ্যায় নিয়নদীপিত ল্যানসডাউন দিয়ে যেতে যেতে সুশান্তর গাড়িতে বসে অমল ভাবল রুনাকে কি তার পুরানো লাগতে আরম্ভ করবে কোনদিন? একঝাঁক শোনা ঘটনা মনে এল মনতাজের মত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বন্ধু অসীম সেন বলেছিলেন বাড়িতে সুন্দরী স্ত্রী আছেন কিন্তু একসকারশানে কোন কোন ছাত্রীদের 'বিশেষ সঙ্গ' দেন। 'স্ত্রীকে বলেছেন?' অমলের উত্তেজিত জিজ্ঞাসার জবাবে চিরপ্রেমিকের জবাব, 'ও ইয়েস। শি ইজ ভেরি স্পোরটিং। বলে এমন তো হতেই পারে। তোমার যা সুন্দর চেহারা।'

সেদিন প্রাক্তন ছাত্র প্রদীপ এক বান্ধবীকে নিয়ে বেড়াতে এসেছিল। চলে গেলে রুনা বললো, 'মেয়েটাকে কেমন দেখলে?'

: ভাল। বেশ ব্রাইট, কেন বলোতো?

: জিগ্যেস করলাম, তোমরা বিয়ে কোরছো কবে? কি বললো জানো? বললো, বিয়ে? কেন? প্লিজ বৌদি আমাদের একটু আনন্দ ফূর্তি করতে দিন। লেটস এনজয় আওয়ার সেলভস।

: এ কথার অর্থ বোঝেন?

মুখ টিপে হেসে রুনা বললো, 'অর্থ তো একটাই এবং সেটা খুব প্রাঞ্জল।'

স্টিয়ারিঙে ক্লান্ত হাত পরিত্যক্ত হতাশ বন্ধুকে দেখে অমলের বুকে ব্যথার ঢেউ খেলে গেল। আত্মপ্রবঞ্চনার মদে এখন শুধু অহংকারের ফেনা। চোখের ভীরুতায় ঘষা জীর্ণ এক পরাজয়। তবু সেটাকে চেপে রাখতে চাইছে এক চেষ্টাকৃত চালবাজি। যেমন এখন হঠাৎ সে বলে উঠলো: 'অম্‌লা তোর জন্যে কষ্ট হয়। এখনও ধুতি পরিস। মদ খাসনা। সরি ছুঁতে মানা। কার মানা? বউয়ের। ফুঃ। ভাল কথা, তোরা বউকে কি করে চিরকাল ভালবেসে যাস বলতো?'

অমল বললো, 'সুশান্ত গাড়ি থামা। আমি এখানেই নামবো।'

সুশান্ত ব্রেক কষে স্টিল চশমার ফাঁক দিয়ে বাঁকা চোখে বললো, 'সেকি? কেন? এ পাড়ায় তোর বউয়ের কোন মাসী থাকে নাকি? কিংবা ঐ কি যেন বলে? ইয়েস, ইয়েস। গিন্নির সই টগর ফুলটুল?'

সুশান্তর বিদ্রূপের মত জ্বালাময় খানিকটা কালো ধোঁয়া ছেড়ে তার গাড়ি চলে গেল। প্রথম শীতের ধূসর বেদনায় ল্যানসডাউনে দাঁড়িয়ে অমল মনে মনে বলে উঠলো, 'রুনা' আমার রুনি। আমাকে বাঁচাও।' ☐



# শ্যামলী মারা গেল কেন ?

'তরুণ প্রেমিকের কঠিন রুমালের ফাঁসে শেষ হল তরুণী প্রেমিকার জীবন। আঠারো বছরের তরুণী বেবি এবং বিশ বছরের ছিমছাম চেহারার তরুণ শান্ত পরস্পরকে ভালবাসতো। শৈশব থেকেই প্রণয়। হঠাৎ দুর্যোগ ঘনিয়ে এল প্রেমিকার জীবনে আট ডিসেমবর সোমবার দুপুরে। হুগলি জেলার চন্দননগর সরকারি কলেজের সায়েনস বিলডিংসের দোতলা থেকে রাত্রে আবিষ্কৃত হলো মৃতদেহ। খুনী প্রেমিকের আত্মসমপণের পর পুলিশ যায় ঘটনাস্থলে।'

সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের সার ওটুকুই। আমাদের খবরের শুরু এর পরই। শান্ত কে ? বেবি কি সত্যিই তার প্রেমিকা ? কবে তাদের পরিচয় ? বয়সে কে বড় ? ওরা কি ক্লাস মেট ? কেন বেবি খুন হলো ? শান্ত কি নিজেই ধরা দিয়েছে ? সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা সে কোথায় ছিল ? এতে ত্রিভুজ প্রেমের ব্যাপার ছিল কি ? কলেজ 'স্ট্যানড' সন্ধ্যা হলেই ফাঁকা হয়ে যায় কেন ?

ঘটনার জায়গা ঘুরে, বেবির ডায়েরির পাতা উলটে, শান্তর চিঠি পড়ে পাওয়া গিয়েছে বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিশ, স্থানীয় বাসিন্দা এমন কি সংশ্লিষ্ট পরিবারের মানুষজনের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলে মিলেছে অনেক অকথিত কাহিনী.....।





যেখানে খুন হয়েছিলো বেবি, সায়েনস ব্লকের অভিশপ্ত সেই স্থান

—ওগো, বেবি যে এখনো ফেরেনি।

খাটের পাশে এসে উদ্বেগের স্বরে বললেন মা। বাবা তখন আড়মোড়া শুয়ে। শুনে জবাব দিলেন, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস আছে হয়তো। তাহলে বেলা দেড়টায় ফিরবে।

খানিক পরে আবার এলেন মা। সওয়া দু'টো বেজে গেছে। ভাতঘুম চোখের উত্তর শুনলেন : তুমি খেয়ে নাওগে।

বেলা তিনটে। যাত্রা দলের নায়েক আসার টাইম হয়ে যাচ্ছে। পালার বই নেবে। কাগজ কলম নিয়ে শেষ পরিচ্ছেদ লিখতে লিখতে হঠাৎ রঞ্জন দেবনাথের খেয়াল হলো—মেয়ে ফিরেছে কি ? স্ত্রীকে ডাকলেন। না, ফেরেনি।

রঞ্জনবাবুও তখন চিন্তিত। কোথায় গেল বেবি ? কান্না কান্না গলায় স্ত্রী বললেন, তুমি একবারটি যাওনা। কলেজের চৌহদ্দি রঞ্জনবাবুর অচেনা। মেয়ে খুঁজে বের করবেন

---

বিশ্বজিৎ সিংহ

---

কি করে ?

মেজদিই বোনের সন্ধানে গেলেন। প্রিয়নগরের অনীতার সঙ্গে পথে দেখা। সে বেবির ক্লাস মেট। সকাল ন'টায় কলেজের সামনে বেবিকে সে দেখেছে। কথাও বলেছে।

নিখোঁজ সংবাদ ইতিমধ্যে চাউর। পাড়ার কেউ এসে অভয় দেন, বোধহয় সিনেমা দেখতে গিয়েছে। উদ্যমীরা সাইকেল চেপে ছোটেন বেবির বন্ধুদের বাড়ি। কেউ হাসপাতালে। এক ফাঁকে শান্তর বাড়িতেও ঘুরে এলেন দুই প্রতিবেশী। শান্তও নেই। সূর্য ডুবতেই জেঠতুতো দাদা থানায় মিসিং ডায়েরি করে এলেন।

রঞ্জনবাবুর তখন বদ্ধমূল ধারণা—কেউ বেবিকে জোর করে আটকে রেখেছে। একজনের ফিসফিস মন্তব্য শোনা গেল : নিশ্চয় শান্তই ওকে নিয়ে পালিয়েছে।

## শি ইজ ডেড

—আমি শ্যামলীকে খুন করেছি।

রাত পৌনে আটটা। চন্দননগর থানায় ডিউটি অফিসার সাব-ইনেসপেকটার পিনাকী উপাধ্যায়। মাথা নিচু করে টেবিলে কাজ করছিলেন। কথাটা শুনেই চমকে উঠলেন। মুখ তুলে তাকালেন।

সামনে এক তরুণ। সে আবার বলে : আমাদের ক্লাসের শ্যামলীকে মেরে গলায় রুমাল বেঁধে এসেছি। কলেজের দোতলায় সিঁড়িতে।

স্বঘোষিত খুনী। পিনাকীবাবু বিস্মিত। তরুণটি নির্বিকার। সোয়েটারে আঙুল ঘষে

## শ্যামলীর ডায়েরি

বিশেষ প্রতিনিধি

১৯৮০ সালের শুরুতে জেঠতুতো দাদা টেবিল ডায়েরি উপহার দেন শ্যামলীকে। ডায়েরি লেখা ছিল শ্যামলীর প্রিয় ব্যাপার। মুখে কখনো যা বলতে পারেনি তাও সে লিখে রেখেছে। তার লেখার সময় ছিল রাতে খাওয়া দাওয়ার পর। এ বছর তার ডায়েরির প্রধান চরিত্র শান্তই। পাতার পর পাতা শুধু তার কথা। লাল, নীল, কালো এ তিন রঙের কালিতে শ্যামলী লিখেছে। ডায়েরির কয়েকটি পাতা ফাঁকাও আছে। ডায়েরির কিছু অংশ ঃ

**১৬ জানুয়ারি, বুধবার**

'...আমার জন্য, পড়ার জন্য শান্তর অনেক চিন্তা। হ্যাঁ, বন্ধুই বটে। এতদিন ওর ভালবাসা নীরব ছিল। এখন সেটা প্রকট হয়ে উঠেছে। আমি নিজেকে অনেক বিশ্লেষণ করেছি। শান্তর প্রতি আমার সহানুভূতি ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু ও আমাকে অন্ধের মতো ভালবাসে।...'

**১৯ জানুয়ারি, শনিবার**

'কলেজে ক্লাসে বসে নেগেটিভ চাইলাম। দিল না। আমি আবার চাইলাম। দিল না। বোঝালাম নেগেটিভ দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ও আমাকে ভালবাসার কথা শোনাতে লাগল।...'

**১২ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার**

'...নিজের সঙ্গে, শান্তর সঙ্গে দিনের পর দিন অভিনয় করে চলেছি। এ অভিনয়ে যে দিন ছেদ পড়বে, যখন জানতে চাইবে কেন আমি ওর সঙ্গে প্রতারণা করলাম, তখন কি জবাব দেব আমি জানি না। কি অন্ধ বিশ্বাস ওর। বিশ্বাস করতে চায় না, আমি ওর সঙ্গে অভিনয় করি। ও আমার মধ্যে কি দেখেছে যার জন্য ওর এত বিশ্বাস ?...

**২৫ মারচ, মঙ্গলবার**

'কাল প্রায় সারা দিনটা শান্ত আমাদের বাড়ি ছিল। সেটা আমি সহ্য করতে পারি না। সন্ধ্যেবেলা আবার 'জরুরী' কথা বলবে বলে এল। কিন্তু ওর আচরণ আমাকে মরিয়া করে তুলেছিল। রাত ৯ টার পর শান্ত গেল।...'

**২১ এপরিল, সোমবার**

'সতুদি চিত্তদার সামনেই বললো, শান্ত বলেছে, আমাদের বাড়ি না এলে ও পড়া ছেড়ে দেবে। ওঃ, কি করে আমি মুক্তি পাব ওর কাছ থেকে চিন্তা করি।'

**২৪ মে, শনিবার**

'আজ দুপুরে একটা নাটক হয়েছে 'ভুল অংক'। হুবহু মিল আছে শান্তর সঙ্গে। রক্তের মূল্য আছে, তাই শান্তর সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব শেষ করে দিতে পারিনি। পারব না আমি। সমরদা বলেছেন, কিন্তু আমি পারছি না। নিঃসঙ্গ হয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না।...'

**১৬ জুন, সোমবার**

'শিবুকে দিয়ে ফটোটা পাঠিয়েছে কিন্তু নেগেটিভটা দেয়নি। এবার আমার আসল মূর্তি দেখতে পাবে। ছলে, বলে, কৌশলে যেমন করে হোক কাজ হাসিল করে নিই। তারপর দেখব ওর মোটিভ। হ্যাঁ, ওর সম্পূর্ণ মোটিভ আমার সঙ্গে প্রেম করে।...'

**২৭ জুন, শুক্রবার**

'...শান্ত আমাকে এত ভালোবেসে ফেলেছে যে আমি অন্য কারও সঙ্গে কথা বললে তার হিংসে হয়। পাছে ভালবাসা ভাগ হয়ে যায়। কিন্তু আমি শত চেষ্টা করেও ওকে এতটুকুও ভালোবাসতে পারিনি। হ্যাঁ, সহানুভূতি ছিল। কিন্তু এখন তাও নেই।...'

**১ জুলাই, মঙ্গলবার**

'কলেজে গেলেই সেই শান্তর সঙ্গে দেখা। ওর সঙ্গে গল্প করতে হবে। ওকে উৎসাহ দিতে হবে। যেন আমার দায়। আমি যদি ওকে সরিয়ে দিই, তবে পড়া ছেড়ে দেবে। কিন্তু লাভ কি হবে তাতে ? আমার একটু সহানুভূতি পেলে যদি ওর পড়া হয়, উন্নতি হয়, জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তবে আর বড় পাওয়া কিছু নেই।...'

**৪ সেপটেমবর, বৃহস্পতিবার**

'পুরুষরা মনে করে মেয়েরা শুধু ভোগের বস্তু। ভাবে যখন খুশি যা খুশি তাই করা যায়। আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করলে বলপ্রয়োগ করে বাহাদুরী ফলায়। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ওদের একটুকুও বাঁধে না। তা সে মেয়েরা যেমন অবস্থায় থাকুক। এই তো আমাদের দেশের পুরুষের ছবি। ভাবতেও ঘৃণা হয়, এদের একজনকেই জীবনসঙ্গী করতে হবে। যেহেতু আমি ভারতীয় রমণী।'

**১০ অকটোবর, শুক্রবার**

'আজ গেছলাম। আজ শান্তর জন্মদিন। তাই ও খেতে চেয়েছিল আমার কাছে। বাড়িতে অবশ্য পরে বলেছি আমি। তবুও খানিকটা গলদ থেকে গেছে।...'

**২১ নভেমবর, শুক্রবার**

'...বিকালে শান্তর একটি চিঠি এসেছে ডাকে। ওর এত সাহস হয়েছে যে ডাকে চিঠি দিয়েছে আমাকে। সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে ও। কলেজ না খুললে ওকে শায়েস্তা করা যাবে না। ন্যাকামো আমার সহ্য হয় না। অনেক হয়েছে আর নয়। আমার ভাগ্য ভাল যে চিঠিতে অন্য কিছু ছিল না।'

---

সে জানায়ঃ আমার নাম তাপস দেবনাথ। বাড়িতে শান্ত বলে ডাকে। আমাকে নিয়ে চলুন। দেখাতে পারবো, কোথায় শ্যামলী।

বেবিই শ্যামলী। কিছুক্ষণ আগে তার মিসিং রিপোরট থানার ডায়েরিতে লেখা হয়েছে। ভালো করে কালিও শুকোয়নি।

খবর পেয়ে ছুটে এলেন সারকেল ইনসপেকটার গোপাল হোড়। এসে গেলেন এস-ডি ও—বি কে মজুমদার, এস ডি পি ও —আর পি সিং। নাইট কলেজের ইনচারজ প্রফেসারকেও আনা হলো।

থানার পাশেই কলেজ। এক মিনিটের পথ। সদলবলে তারা সায়েনস বিলডিং-এর দোতলায় উঠলেন। ছাদে যাবার সিঁড়ির মুখেই লুটিয়ে শ্যামলী। চাদর ঢাকা। চাদর সরিয়ে সঙ্গের ডাক্তার বললেনঃ শি ইজ ডেড। শান্তও দাঁড়িয়ে। চোখ দুটো যেন পাথরের।

ওদিকে বুড়ো শিবতলার সুশীল পল্লীতে এক গোমড়া হাবিলদার হাজির। গম্ভীর স্বরে রঞ্জনবাবুকে ডাকলেন।

—আপনার মেয়ের নাম কি ?

—শ্যামলী।

—কলেজে কখন গেছে ?

—সকালে।

—আসুন ও থানায় আছে।

—বেঁচে আছে আমার বেবি ?

—সরকারিভাবে কোন কথা বলতে পারি না।

জীবনে যিনি বহু ট্রাজেডি দৃশ্য লিখেছেন সেই 'অগ্রদূত' ছদ্মনামের রঞ্জন দেবনাথ আশংকায় কেঁপে উঠলেন। আর্তনাদের সুরে স্ত্রীকে বললেন, আমার মন বলছে, বেবি আমাদের বেঁচে নেই। ওর মরা মুখ আমি দেখতে পারবো না গো।

থানায় গেলেন বড় ছেলে। ফিরে পেলেন আদরের বোনকে। কিন্তু সেভাবে কেউ পেতে চায় না। শোকার্ত দাদাকে সান্ত্বনা দিয়ে তদন্তকারী অফিসার জানালেনঃ খুনী আত্মসমর্পণ করেছে। আপনার বোনের ক্লাসমেট শান্ত। তা ওদের মধ্যে কবে থেকে মেলামেশা ?

### শ্যামলীদি, 'আপনি'

রোগা ছিমছাম ছেলেটি প্রথম বেবিদের বাড়ি আসে ১৯৭৯ সালের মাঝামাঝি। বন্ধুদের সঙ্গে। সেই শুরু।

চন্দননগর সরকারি কো-এডুকেশন কলেজে বারো ক্লাস সায়েনসের ছাত্র ছেলেটি। শ্যামলীও একই সাবজেক্ট নিয়ে ভর্তি হয়। রঞ্জনবাবুর পরিবারের কেউ ইস্কুলের সীমানা ডিঙোয়নি। বেবির ইচ্ছা সে ডাক্তার হবে।

**সাড়ে সতেরো বছরের তাপস দেবনাথ নিজেই থানায় ধরা দেয়। বলে, আমি শ্যামলীকে খুন করেছি। মৃতার দেহ কোথায় তাও সে জানায় এরপর পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদে সে অনেক কথা বলে। চন্দননগর থানার অফিসাররা তার নোট করেছেন, টেপরেকরডারেও ধরে রেখেছেন। তাপসের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই এই বিবরণী।**

# ইস্, কেন মারলাম ওকে !

বিশেষ প্রতিনিধি

শান্ত সেদিন ক্লাসে যায়নি। সে অপেক্ষায় ছিল কখন কলেজ শেষ হবে। শ্যামলীকে একা পাবে। তাকে জরুরী দরকার। তর সইছিল না।

শ্যামলী প্রথমে তার সঙ্গে যেতে চায়নি। কী ভেবে রাজী হল। ওরা দু'জনে গেল সায়েনস বিলডিং-এর দোতলায়। মরনিং ক্লাস শেষ, ডে কলেজের নতুন সেসন শুরু হয়নি। ছাদে যাবার সিঁড়ি বড়ো নির্জন। ওখানেই বসে ওরা।

প্রায় চার ঘণ্টা কথা হয়। কথাকাটা-কাটিও। একসময় শ্যামলী বলে উঠে, ঃ তোর জ্বালায় এখানে আর থাকতে পারবো না। তুই বড়ো অশান্তি করছিস ভালো লাগছে না।

শান্ত ঃ চল দু'জনে পালিয়ে যাই।

শ্যামলী ঃ ভেবে দেখি। আগে তুই আমাকে শান্তিতে থাকতে দে।

শান্ত ঃ তুই তাহলে মরে গেলে শান্তি পাবি।

শ্যামলী ঃ কি করে মরি বল। কে মারবে ?

শ্যামলীর মৃত্যুর দিনই রাতে চন্দননগর থানায় ঝানু অফিসাররা শান্তকে জেরা করেন। রাত দশটা থেকে তিন ঘণ্টা। এ সময়ের কথার বিবরণে জানা যায়, শান্ত সত্যিই শ্যামলীর গলা টিপে ধরে। শ্যামলী জ্ঞান হারায়। যতক্ষণ না এলিয়ে পড়ে গলা ধরে থাকে।

শান্তর পকেটে ছিল শ্যামলীর রুমাল। সেটিই সে শ্যামলীর গলায় সজোরে বাঁধে। শ্যামলীর গায়ে চাদর ছিল। সেটি দিয়ে পরিপাটি করে সারা দেহ ঢেকে সে নেমে আসে।

বেলা আড়াইটা। বাড়ি ফেরে। রিকশায়। মনের অবস্থা কাহিল। মা খেতে দেন। দু' গ্রাসও মুখে দিতে পারে না। শ্যামলীকে মনে পড়ে যায়। গা গুলিয়ে উঠে।

থাকতে না পেরে শান্ত মাকে সব বলে। তিনি বলেন, তোর যেখানে খুশী চলে যা। পাড়ার এক দাদাকেও ধরে। বলে আমাকে থানায় নিয়ে চলুন। তিনি রাজী হন না।

বাড়ি থেকে বের হয় শান্ত। গায়ে সোয়েটার চাপায়। গঙ্গার ধারে গিয়ে ঘোরে। ভাবে, আত্মহত্যা করবে। পারে না। বিভ্রান্তের মতো কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে সে ঠিক করে, আত্মসমর্পণ করবে। তাই একা থানায় চলে আসে।

কিন্তু শান্ত তার ভালবাসার জন শ্যামলীকে মারলো কেন ? শ্যামলীর বাবা রঞ্জন দেবনাথের দৃঢ় বিশ্বাস দুই কারণ ঃ এক সে বুঝেছিল, গরিব বলে ওই পরিবারের মেয়েকে সে কখনো পাবেনা। দুই, নিজে পাবে না বলে যে অন্যের হাতে শ্যামলী চলে যাবে তাও হতে দেবে না।

এক পুলিশ অফিসারের মন্তব্য, ছেলেটি প্রথমে ভেবেছিল বাড়ি থেকে পালানোয় মেয়েটিকে সে রাজী করাতে পারবে। তাই চার পাঁচ ঘণ্টা কথা বলে। কিন্তু সে বোঝে তার চিন্তায় কাজ হচ্ছেনা। তাই মেয়েটিকে গেইন করতে পারবে না এ হতাশায় ওই চরম কাণ্ড করে বসে।

শ্যামলীর মৃত্যুর দিন রাতে শান্ত ছিল থানা হাজতে। এক পুলিশ অফিসার নিজের কানে শুনেছেন, ওই ছেলেটি অস্ফুট স্বরে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে ঃ ইস্, কেন মারলাম ওকে !

কয়েকদিন ক্লাস করেই বেবি বোঝে, ঐ রোগা ছেলেটি পড়াশোনায় বেশ ভালো। তার লেখাপড়ায় ওর সাহায্য কাজে দেবে। ছেলেটি তাপস দেবনাথ, শান্ত। থাকে লাগোয়া সরকারি কলোনীতে। বেবির বাড়ি থেকে মিনিট পাঁচেক পথ।

প্রথমদিকে শান্ত ডাকতো 'শ্যামলীদি আপনি।' শ্যামলী আপত্তি করেনি। হোক না ক্লাস মেট, সে যে বয়সে মাস ছয়েক বড়ো। তাছাড়া শান্তর বড়দি অকালে মারা গিয়েছেন। এ ভেবেই বোধহয় দিদি ডাকে।

শ্যামলীর সাইনাস অপারেশন হয়। পরে ব্যাপেনডিসাইটিসও। শরীরটা চিরকালই দুবলা। কিন্তু তার দৈনন্দিন জীবন ছকে বাঁধা। ভোর চারটেয় ঘুম শেষ। সওয়া দু'ঘণ্টা পরে তালডাংরা মোড় থেকে দু' নং বাসে চেপে কলেজের দিকে রওনা। সাধারণত টায়, প্র্যাকটিক্যাল থাকলে সাড়ে বারোটা একটায় বাড়ি ফেরা। তার হাত খরচা বরাদ্দ ছিল প্রতিদিন দু'টাকা।

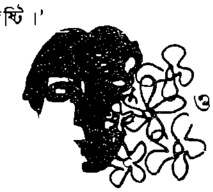
স্নান খাওয়া সেরে দুপুরে বইপত্তর নিয়ে বসা কখনো সেলাই। সন্ধ্যায় দিদির সঙ্গে প্র্যাকটিস। সাতটা নাগাদ আসতেন ভট্টাচার্য, প্রাইভেট টিউটর। দেড় ঘণ্টা পড়াতেন। শান্তও বিমানবাবুর বাড়িতে পড়তে যেত। মাসটারমশাই চলে গেলে খেয়েদেয়ে রাত এগারটা পর্যন্ত আবার পড়া।

ঘরকুনো স্বভাবের শ্যামলী। বিনা দরকারে কোথাও বের হতো না। মেজদি শতদলকে ডাকতো 'সতুদি'। সেই বান্ধবী।

ছোটো খাটো কালো মেয়ে শ্যামলীর দারুণ ব্যক্তিত্ব। মানুষকে বড়ো কাছে টানতো। শান্তর আসা যাওয়ার শুরু পরিচয়ের কয়েকদিন পরই। প্রথমদিকে বই নিতে, খাতা দিতে। পরে এমনিই।

সতুদি ঠাট্টা করতেন, এই মিনিমুখো এসেছে রে। শ্যামলী উষ্মার সুরে বলতো ঃ কি যে বলিস। ও বড়ো গরিব। বাবা সবজি বেচে সংসার চালায়। মাও কাজে ব্যস্ত। বাড়িতে স্নেহ করারও কেউ নেই।

ছেলেটা লাজুক লাজুক। খাটে উঠে বসতেও সংকোচ। আস্তে আস্তে কথা। মেজদি কান পেতেছেন। কী বলে ও ? শুনেছেন, ক্লাসে কোন চ্যাপটার পড়ানো হলো, কোন প্রফেসর ভালো পড়াতে পারেন না, বিমানদা কেমন বোঝায় এসব গল্প। প্রতিবেশী এক বৌদি অবশ্য লক্ষ্য করেন ঃ 'কেলে কুঁজো ছেলেটা মওকা পেলেই বেবির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বড়ো তীব্র দৃষ্টি।'



## ও মানুষ হোক

দিদি বিজলী একদিন বোনকে ঠাট্টা করেন ঃ শান্তকে ভালোবাসিস ? বেবি হেসে ফেলেছিল ঃ ও যে আমার চেয়ে ছোট।

তবে শ্যামলীরও টান ছিল। শুধু বই নয় সে শান্তকে চুপিসারে দু'এক টাকা করে দিত। টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে। তালডাংরা মোড়ে অপেক্ষা করতো শান্ত। একসঙ্গে কলেজ যেত বাসে। ভাড়া গুনতো শ্যামলীই।

শান্ত আবদার করতো ঃ বেবিদি, খাওয়ান। না বলা শ্যামলীর স্বভাব নয়। শান্ত যখন যা চাইতো খাওয়াতো। পরে আবদার দাবির রূপ নেয়। প্রায়ই সে বলতো ঃ খেয়ে আসিনি। চোখ থেকে গগলস খুলে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে টাকা বের করা ছিল শ্যামলীর রোজকার ঘটনা।

এই সাহায্য দেবার কথা শ্যামলীর ডায়েরিতেও আছে। ১৩ অকটোবর, ১৯৮০

# শান্তর চিঠি, বেবিকে

22.10.80
8-00 P.M.

বেবী,

তুই আমাকে চিঠি লিখতে বারণ করেছিস কেন ? তোর নাকি অসুবিধা আছে। বেশ, ভালো কথা। কিন্তু বেবী অনেক অসুবিধাই তো আমার জন্যে তোকে সইতে হচ্ছে আর একটু নয় করবি। তোর সাথে যে কিছু কথা বলব তারও উপায় নেই। অনেক অসুবিধা। কিন্তু কথা না বললেও ভাল লাগে না। পুরানো কথা বলে কি হবে। আজ তুই বুঝবি না।

তোর কাছ থেকে আমি কি এমন চেয়েছি ? এইটুকু শুধু করতে দে। আমি তোর অসুবিধার কথা জানতে চাই না। আমার জন্যে এটুকু করবি না ? অনেক সময় এমন অনেক কথা মনে হয় যা তোকে না বলে পারি না। আমারও সময় হয় না কিংবা তোর। তোর তো সময়ই নেই। কথা বলতে গিয়ে নানা বাধাবিঘ্ন। তাই তো তোকে লিখি। বেবী, আমি তোকে না লিখে কিছুতেই শান্তি পাব না। অন্তত আমার পড়াশুনার কথা ভেবে তুই আপত্তি করিস না, প্লীজ। এখন সব থেকে পড়াটাই বড়। আমার আর কি আছে বল ? ঐটুকু ছাড়া আর কি পাব আমি। কিন্তু আমার যে অনেক কিছুর অনেকটাই তোকে নিয়ে। তোর প্রভাবকে অস্বীকার করে তো কোন লাভ নেই। বেবী, মনটা হালকা রাখার জন্যেই আমি লিখতে চাই। তুই আর আমায় বারণ করিস না। তোকে কিছু বলতে পারলে তো আর তা দরকারই হয় না কিন্তু তুই নিজেই তো দেখতে পাস তা হচ্ছে না। একটা কিছু নিয়ে তো আমায় থাকতে হবে। আর একটু মানিয়ে নে। তুই তো ভাল মানিয়ে নিতে পারিস। এটাও মেনে নে। অন্তত বন্ধুর ( সত্যি কি ? ) এই অনুরোধটুকু রাখ। মনের উপর যে চাপ পড়ে তা হয়তো সহ্য করতে পারি। তা ভুলে থাকার মতো উপায় আমার কাছে আছে। কিন্তু আমি যে পড়তে পারব না। পারি না. সেই উপায় করলে যে পড়া হবে না। পড়াশুনা না থাকলে আমি এত ভাবতাম না। ভুলে থাকার মতো বিস্মৃতির অতলে ডুবে যাওয়ার মত জিনিস তো আছেই। সেই যাদুকাঠি। যা আনে চির শান্তি। আর অসুবিধা তোকে তো আমি বলেছি সেটা তোর উপর নির্ভর করে। তুই তো এখনও ছোট না। তোর কি ইচ্ছা নেই কোন। তোর উপরই অনেক কিছু নির্ভর করে বেবী। আর যেখানে মিথ্যা নেই, অন্যায় নেই, পাপ নেই, কোন জটিলতা নেই সেখানে এত সমস্যা কেন আমি চাই ভালোভাবে একটু লেখাপড়া করতে, আর সেটার জন্য আমার পাশে তোকে বিশেষভাবে পেতে। সব না হলেও প্রধান জিনিসটাই তোর উপর নির্ভর করে। আর আমরা তো খারাপ কিছু করছি না। বন্ধুকে কি বন্ধু চিঠি লিখতে পারে না ? তবে এত অসুবিধা কিসের ? আর বন্ধু যদি নাই হই। কলেজের সহপাঠী হিসাবেও তো আমি লিখতে পারি। এত গোঁড়ামী কিসের ? এটা তো তোর উপর পুরোপুরি নির্ভর করে। তোকে কি কেউ চিঠি লেখে না ? বন্ধুর অধিকারেই আমি লিখব। বেবী, তোর সহযোগীতা ছাড়া কিছু করতে পারব না। প্লীজ, আমার জন্য এইটুকু কর। আমাদের সহজ সম্পর্ককে জটিলতার মধ্যে কে আনে কেন আনবে ? সহজ বন্ধুর সম্পর্কে কি এতই সন্দেহ, মিথ্যা, সমস্যা ; বাঃ বেশ মজার ব্যাপার তো। অথচ চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছি কত 'ব্যাপার'। আমার চেয়ে তো তুই আরও ভালো দেখতে পাবি মনে হয়। কারণ আমার চেয়ে তোর দেখার সুযোগ বেশি। ক'জনের সাথেই বা তেমন ভাবে মিশলাম।

আমি এটুকুই শুধু বলতে চাই কোন অন্যায় না করেও কেন এত সমস্যা তবে আমাদের। অথচ যখন সত্যি কিছু ঘটে সকলেই চুপ থাকে। এর মানে আমাকে বলে দিবি ?

আসলে ব্যাপারটা কি জানিস, আমরা ঠিক বন্ধুও না, আবার প্রেমিক প্রেমিকাও না। দুটোর একটাও নয়। তাই যদি হতাম তবে এত কিছু হোত না। বন্ধুই যদি হতাম তবে সব কিছুতে এত নিষেধাজ্ঞা কেন ? সকলের মেনে নিতে এত কষ্ট কেন ? জানি কেন ? কিন্তু একটা মিথ্যা ব্যাপার নিয়ে হৈ চৈ করে লাভ কি ? এ কি সত্যিটাকে ভুলে থাকার অপচেষ্টা ? না কি হুজুক প্রকৃতপক্ষে এটা একটা ভুয়ো সংস্কার, এটা আমাদের মজ্জাগত, জন্মগত। সম্মান ? নিশ্চয়ই অনেক বড় জিনিস। কিন্তু হাসি পায় তখন সেখানে সম্মানহানীর কোন ভয় নেই অথচ সেখানেই নানা উৎপীড়নের ফলে, সুন্দর জিনিসটাই নষ্ট হয়। আমি দেখছি, মিথ্যেটাকে নিয়ে মাতামাতি করে যেন সত্যিটাকে ভুলে থাকা। সত্যি গোপন করার চেষ্টা। এই সম্মান অসম্মান যেন একেক জনের মনের মত করে গড়ে তোলে। অবাক হই আমি যখন দেখি যেখানে সত্যিই সম্মান-হানির আশঙ্কা ( একজন ঘনিষ্ঠতম মানুষের

---

শুক্রবার সে লেখে ঃ '...আজ শান্তর জন্মদিন। তাই ও খেতে চেয়েছিল আমার কাছে। বাড়িতে অবশ্য পরে বলেছি আমি। তবুও খানিকটা গলদ থেকে গেছে।'

মাঝে মধ্যে শ্যামলী রেগে যেত ঃ 'আমার কি রাজার গোলা আছে যে দেবো।' শান্ত নীরব। শ্যামলীও তা দেখে জল। নিজেকে দমিয়ে রাখতে পারতো না।

মেজদি টাকা দিতে বারণ করেন। শ্যামলী বলে ঃ কি করি বল ? পাশের পাড়ায় থাকে। এক ক্লাসে পড়ে। দেখা হলেই চায়। না দিলে বিরক্ত করে।

বাড়িতে শান্ত মাঝে মধ্যে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিত। ওর মা শ্যামলীর কাছে খবর পাঠাতেন। শ্যামলী না গিয়ে পারেনি।

শান্তর এ বাড়িতে আসা যাওয়া যখন : সময়ের বালাই ছিল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুজনে। ঘরে, ছাদে। আপনি তখন তুই, শ্যামলীদি শুধু বেবি। সতুদির মনে হয়েছিল, ছেলেটার চাউনিতে অন্য খিদে।

রঞ্জনবাবু শান্তকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না। দেখতেন মুখ তুলে কথাও বলতে পারে না। ভেবেছিলেন, নিজের স্ট্যাটাস সম্পর্কে ছেলেটা কমপ্লেকসে ভোগে।

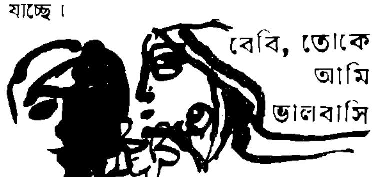
পরে ঘন ঘন আসা যাওয়া তারও ভালো লাগেনি। মেধাবী ছাত্র শুনে প্রথমে কিছু বলেনওনি। মেয়েকে ডেকে একদিন জিজ্ঞেস করেন, তুই টাকা, বই দিস কেন ? মেয়ে জবাব দেয়, আমি চাই ও মানুষ হোক। আমার সাহায্যে যদি কেউ প্রতিষ্ঠা পায় আপত্তি করবে বাবু ?

১ জুলাই ১৯৮০। মঙ্গলবার। শ্যামলী ডায়েরিতে লিখেছে ঃ '...আমার একটু সহানু-ভূতি পেলে যদি ওর পড়া হয়, উন্নতি হয়, জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তবে আর বড় পাওয়া কিছু নেই।...'

কিন্তু বাবা পরে দেখেছিলেন, খাটে মুখ নিচু করে বেবি কি লিখছে। পাশে বসে শান্ত। বেবির মুখের দিকে তাকিয়ে। রঞ্জনবাবু থামতে না পেরে শান্তকে বলে ফেলেন ঃ 'গরিবের ছেলে তুমি। লেখাপড়া করে বড় হবার দিকে মন দাও।' ছেলেটি চুপ, মাথা নিচু।

এতেও শান্তর কোন পরিবর্তন হয়নি। আসা যাওয়াও বন্ধ করেনি। রঞ্জনবাবু লক্ষ্য করেন, ছেলেটা আস্তে আস্তে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। ইতিমধ্যে শান্তর হিতৈষী পাড়ার চিত্তবাবু শ্যামলীর কাছে আসেন। শান্তকে প্রশ্রয় দিতে বারণ করেন। শ্যামলীর মাও বলেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অত কী কথা তোদের ?

মেয়ে কষ্ট পাবে ভেবে সরাসরি কিছু না বলে তিনি শুনিয়ে শুনিয়ে জানিয়েছিলেন ঃ 'আমি বেবির বিয়ে দিয়ে দেবো।' তার নজর এড়ায়নি, শান্তর নরম চোয়াল কঠিন হয়ে যাচ্ছে।




সেপটেমবর,'১৯৮০। শান্তর শ্যামলীর বাড়ি আসায় ছেদ পড়ে। কিন্তু দেখা সাক্ষাৎ

কথার উপর ভিত্তি করে অবশ্য ) সেটাকেই মানুষ দেখতে পায় না। সেটা থেকেই চোখ ফিরিয়ে থাকে। অবশ্য আমার ধারণা অন্য। এসব ক্ষেত্রে আমি মনে করি সম্মান অসম্মানের কোন প্রশ্নই ওঠে না। এগুলো বলে তারাই, যাদের এ জিনিসটা নিয়ে মিথ্যে ঠুনকো অহংকার আছে যার কোন অর্থ নেই, নেই কোন মূল্য।

বেবী, আমরা যদি সত্যি সত্যি প্রেম করতাম তবে বোধ হয় কেউ এমন করে বলতো না। কেন না যাই হোক, এটাই যে স্বাভাবিক। কিন্তু কথাটা ভাবতে গেলে মনটা আমার বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। ছিঃ, মানুষের মন কত ছোট তাই ভাবি। আর দেখছি তো সবকিছু। প্রত্যক্ষ প্রমাণই পেলাম তার। প্রেম, প্রেম, প্রেম। সকলে যেন একটা কথাই জানে। অবশ্য কাউকে এ জন্যে দায়ী করা যায় না। আমরা যে বারে বারে তাই করেছি। সবকিছুর পরিণতিতে সেই যেন দুটো অক্ষর। শেষ পর্যন্ত সকলেই একটা পথে গেছে।…

বেবী, তোকে বলেছিলাম মনে আছে? আমার কাছে এমন কিছু সংগ্রহ আছে যা তোকে দেখাব বলছিলাম। হ্যাঁ, জীবনের চলার পথে কিছু জিনিস সংগ্রহ করতে পেরেছি। কিছু জিনিস বিবেকের তাড়নায় নষ্ট করে ফেলেছি সম্প্রতিকালের কিছু জিনিস কিন্তু আজও আছে। বর্তমান অতীত মিলিয়ে সামান্য কিছু জিনিস কিন্তু তার দাম অনেক অনেক। যার দাম একটা সুন্দর…না থাক। শিক্ষা, বিবেক, বিবেচনা বড় হিসেবী। একটুও হিসাব ছাড়া চলে না। চুলচেরা বিচার করে তবে কোন জিনিস করতে চায়।

তোর মনে আছে কিনা জানি না তবে আমি জানি, আর আমি তা জানবই। বেবী যারা তেমন শিক্ষা পায়নি তাদের সাথে আমি কেন যেন কথাও বলতে পারি না। ভাল লাগে না। বিশেষ করে মেয়েদের কথা, এমন অনেক মেয়ের কথা জানি, যাদের কথা বলায় আড়ষ্টতা, কেমন যেন বোকা বোকা ভাব। আমি একদম সহ্য করতে পারি না। আমি কিন্তু ঠিক অশিক্ষিত বা লেখাপড়া না জানা লোকের কথা বলছি না, লেখাপড়া না শিখলেও বুদ্ধি থাকে, বিবেচনা থাকে আমি তাদের কথা বলছি না। আমি যাদের কথা বলছি তাদের দেখা তুই পেয়েছিস? পাবি। ( অবশ্য আমি তেমন একজন )।

আমি, একটি অতি সাধারণ ছেলে। ভীরু, দুর্বল মন আমার। ( সকলে তুই তাই তো বলে )। আমার থেকেও যার 'আমাকে' বেশি জানে। কোন আসা নেই, আমার। জানি না কতখানি সত্যি। তবে আমি শুধু জানি, উত্তাপেই বরফ গলে যায়। আগুনের আঁচ না পেলে বরফ যে কঠিনই থাকে।

আগুনেতে তো তাকে নরম, কোমল মনে হবেই। তখন আর আঘাত সইবার ক্ষমতা থাকে না। ভেঙে পড়ে। কিন্তু সে যে উত্তাপের কাছেই। কিন্তু এতেই কি শুধু প্রমাণ হয় তার আসল রূপ। জানি না। জানিনা কিছু। তবু এই ছেলেটা অনেক অনেক দিনের অনেক ঘটনার অনেক দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শী। যার তুলনা নেই। পুরনো অথচ সুন্দর, মনোরম, আরও নতুন, চির নতুন। স্বপ্ন তো চিরদিনই স্বপ্ন। এ যে শুধু ক্ষণিকের সুখ ( সুখের স্বপ্ন ) আনে। বাস্তবে ভাবতে গেলে পেতে হয় শুধুই দুঃখ।

অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি ভালোবাসার কথা, ভাল লাগার কথা, এ মিথ্যে স্নেহের কথা, সবকিছুই মিথ্যে বুলি।" আমি শুনেছি গাঢ় গলায় বলতে, 'তোর সঙ্গে একদিন কথা বলতে না পারলে থাকতেই পারব না।' কিংবা 'যতদিন থাকব তোর কথা ভুলব না মিথ্যে সব মিথ্যে। কতগুলো সাজানো বুলি আওড়ানো। এগুলো ঘটনা। নিজের জীবনের সামান্য অভিজ্ঞতা।

ভালবাসা? স্নেহ? মমতা? এর পিছনেও বুঝি কোন উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য হয়তো মহান, পবিত্র। কিন্তু তবু তো উদ্দেশ্য। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসার উদ্দেশ্য কি? কামনা-বাসনা। পবিত্র মহান, স্বার্থহীন ভালোবাসা? সে বুঝি মেয়ের প্রতি বাবার ভালোবাসা, স্নেহ। কোথায় যেন পড়েছিলাম 'কোন যুবতী স্ত্রীকে তার যুবক স্বামী ভাল না বাসে'। স্বাভাবিক।

জানি না তোকে কেন এসব লিখলাম আর নয় এবার শেষ করব। আটটায় লিখতে বসেছি এখন দশটা। বেবী, আমি তোকে লিখেছি। ইচ্ছা হলে যে কেউ দেখতে পারে। আমি মনে করি এমন চিঠি বুঝি সবার জনাই। তবু তোকে দিলাম। অন্য কেউ হলেও আমি এসবই লিখতাম। তোকে আমি ভালবাসি। আমায় কেউ একজন বলেছিল তোকে আমি কি চোখে দেখি? As a lover or friend or…। সেই মুহূর্তে আমার মাথায় অনেকগুলো ভ্রমর একসঙ্গে গুনগুন করে উঠেছিল। হুঃ, এটাই তো স্বাভাবিক যা ঘটেছে, ঘটছে, ঘটবে, ঘটাচ্ছে, ঘটিয়েছে, ঘটাবে। এছাড়া কেউ কিছু চিন্তাই করে না। মানুষ তো? জানি তুই বুঝবি না কিছু। মনে হয় প্রলাপ। ভালবাসা রইল। ইতি—শান্ত

**[ চিঠির বাক্য গঠন ও বানান অবিকৃত রাখা হয়েছে—সম্পাদক ]**

---

মেলামেশা বন্ধ হয়নি। বাড়ির লোকেরা পারেননি। কলেজ যাবার পথে, ক্লাসে শুধু দু'জন। গঙ্গার ধারে বসে গল্প। শ্যামলীও বুঝেছিল শান্তর সঙ্গে তার সম্পর্ক দ্রুত পালটে যাচ্ছে। কী করবে সে? বাড়ির মনোভাব বুঝে সে আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে নিতে থাকে।

শান্ত ছাড়বে কেন? সে ব্যাগ থেকে ফটোর নেগেটিভ লুকিয়ে রাখে। শ্যামলী ভয়ে মরে। বলে, দে না রে ফটো নিয়ে কী করবি? আমি তো আছি।

বই, খাতাও এভাবে নিজের কবজায় রেখে দিত শান্ত। সারেনডার করা ছাড়া শ্যামলীর পথ ছিল না। মনে ঝড়।

শ্যামলী উপায় না দেখে শান্তকে বলে: তুই এরকম করলে সামনের মারচে পরীক্ষা দিয়েই দিদির বাড়ি চলে যাবো। ওখানেই পড়বো।

শান্ত আরো অশান্ত। কাক ভোরে সাইকেল নিয়ে তালডাংরো মোড়ে, ক্লাসে শ্যামলীর কাছাকাছি। যেখানেই শ্যামলী সেখানেই হাজির সে। আশ যেন মেটে না। সকলে মুখ টিপে হাসে। শ্যামলীর বিরক্তি চরমে। শান্তর ভ্রুক্ষেপ নেই।

শ্যামলীর উপেক্ষা তাকে আরো মরিয়া করে তোলে। শুরু করে চিঠি লেখা। প্রথম ক্লাসে, খাতার ফাঁকে গুঁজে দেওয়া। শ্যামলী সে সব ছিঁড়ে দিত। এরপর ডাকে চিঠি। ২২ অকটোবর ১৯৮০ তারিখের চিঠিতে শান্ত বেবিকে লিখেছে: 'তুই আমাকে চিঠি লিখতে বারণ করেছিস কেন? তোর নাকি অসুবিধাই আছে। বেশ ভালো কথা। কিন্তু বেবি অনেক অসুবিধাই তো আমার জন্য তোকে সইতে হচ্ছে, আর একটু নয় করবি।'

চিঠিতে সে আরও লেখে: 'কথা বলতে গিয়ে নানা বাধা বিঘ্ন। তাই তো লিখি। বেবি, আমি তোকে না লিখে কিছুতেই শান্তি পাব না।…আমার যে অনেক কিছুরই অনেক-টাই তোকে নিয়ে। তোর প্রভাবকে অস্বীকার করে তো লাভ নেই। বেবি, মনটাকে হালকা রাখার জন্যই আমি লিখতে চাই তুই আর আমায় বারণ করিস না।…তোকে আমি ভালবাসি।

শান্তর চিঠি এলেই শ্যামলী যেত ছাদে। দু'চারটি বাদে সবগুলিই পুড়িয়ে দিত। মৃত্যুর দিন সতেরো আগে শেষ ডায়েরি লিখেছে শ্যামলী। ২১ নভেম্বর ১৯৮০ শুক্রবারের পাতায় আছে: '…বিকালে শান্তর একটি চিঠি এসেছে ডাকে। ওর এত সাহস হয়েছে যে ডাকে চিঠি দিয়েছে আমাকে। সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে ও।

চিঠি লিখেও কোনো ফল না দেখে শান্ত পুরনো কৌশল নেয়। বই আটকে রাখে। শ্যামলী ছোটো বোনকে পাঠায় শান্তর বাড়ি। সে খালি হাতে ফিরে আসে। বলে, অন্যের হাতে দেবে না।

শ্যামলীর মৃত্যুর আগের শুক্রবার। শান্ত বই ফেরত দেবার অছিলায়' শ্যামলীর বাড়ি আসে। বেলা এগারটায়। ছিল টানা ছ'ঘণ্টা। শ্যামলীর এদিন দুপুরে খাওয়াও হয়নি।

মৃত্যুর আগের সন্ধ্যায় দিদি ও তার বান্ধবীর সঙ্গে স্থানীয় কৈরী সিনেমা হলে




ঐ কলেজেই ওরা পড়তো

'দাদার কীর্তি' দেখতে যায় শ্যামলী। বইটি শান্তর আগেই দেখা। তবু শ্যামলীকে দেখে সে এগিয়ে আসে। প্রকাশ্যে বলে, আমার টিকিটও কাট। তোর সঙ্গে দেখবো। ধৈর্যের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে শ্যামলী বলে উঠে: তুই আমাকে জ্বালিয়ে মারছিস কেন? শান্ত হাসে।

## কাল দিন

সেদিন আট ডিসেম্বর, সোমবার। সাড়ে ছ'টা নাগাদ শ্যামলী বাড়ি থেকে বের হয়। নাইলন প্রিনট শাড়ি, সবুজ ব্লাউজ, কানে দুল, হাতে ঘড়ি। কাঁধে সাইড ব্যাগ, গায়ে চাদর। কালো গগলসটি এদিন সে চোখে দেয়নি।

কলেজে ক্লাস শেষ হয় বেলা ন'টায়। দুই বান্ধবীর সঙ্গে গল্প করতে করতে সে গেট থেকে বের হয়। গঙ্গার ধারে স্ট্র্যানডে দাঁড়ায়।

হঠাৎ উদয় হয় শান্ত। শ্যামলীকে ডাকে। বলে: শোন, কথা আছে। ভুরু কুঁচকে শ্যামলী জবাব দেয়: এখানেই বল। শান্ত জানায়: সবার সামনে বলা যাবে না।

দু'জনে এগিয়ে যায় কলেজের ভিতরে। ঘাড় ঈষৎ ঘুরিয়ে বান্ধবীকে শ্যামলী বলে, কাল দেখা হবে।

কিন্তু এদিনটাই শ্যামলীর 'কাল' হয়ে যায়।

## কেউ আসেনি

শান্তর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে খুনের। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায়। পরদিন চন্দননগর আদালতে তাকে হাজির করা হয়। কেউ তার হয়ে জামিন চায়নি। এমনকি বাড়ির বা পরিচিত কেউ থানায় আসেনি। শান্ত এখন আছে চুঁচুড়া কারাগারে।

## ফাঁকা স্ট্র্যানড

হুগলি জেলার সুন্দর প্রাচীন শহর চন্দন-নগরে মনোরম জায়গা হলো স্ট্র্যানড রোড। স্থানীয়রা বলেন, 'স্ট্যানড'। গঙ্গার ধারে এ এলাকাতেই কলেজ, কোরট, থানা।

সন্ধ্যার পর নিত্যদিন এ অঞ্চল ভিড়ে উপচে পড়ে। মানুষ বেশি জড়ো হয় জোড়ায় জোড়ায়। চন্দননগর সরকারি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র প্রদীপ কুমার গুহ নিয়োগীর কথায়, অন্তত ষাট-সত্তর জোড়া এখানে ঘুরতে আসেন। হাওয়া খেতে, মনের কথা খুলে বলতে।

কিন্তু শ্যামলী কাণ্ডের পর স্ট্র্যানড ফাঁকা। সূর্য ডুবলেই সারা এলাকা খাঁ খাঁ। বিশেষ করে মেয়েদের তো চোখেই পড়ে না।

ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করতেই থানার সি-আই গোপাল হোড় জানালেন: গারজেনরা এলারট হয়ে গিয়েছেন। আর মেয়েরা নিজেরাও ভয় পেয়েছে। □

**আলোকচিত্র: সৌগত রায় বর্মণ**



না, স্ট্র্যানডে একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকাও নেই



# শহুরে ভিড় পৌষ মেলাকে নোংরা করে ফেলছে



যীশু চৌধুরী

বক্তৃতা শেষ হল। বক্তা আসন নিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে একদল 'সাধু সাধু' বলে বক্তাকে অভিনন্দন জানালেন। কিন্তু মুহূর্তে পরিবেশের ভাব-গাম্ভীর্য গেল কেটে। শ্রোতাদের একদল সভা-সমিতির অতি পরিচিত ঢঙে হাততালি দেওয়া শুরু করলেন। পূর্বোক্ত দল ভ্রুকুটি ভরা চোখে এদের দিকে তাকালেন। অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ জুড়ে অস্বস্তি। কিন্তু কে শোনে কার কথা। হাততালির চটপটি বাজতেই থাকল। 'সাধু সাধু' রব কোথায় চাপা পড়ে গেল।

বিশ্বভারতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানের এই বিমিশ্র ছবির সাক্ষী বর্তমান প্রতিবেদক। ১৯৭৯ সালে অনেক দিন পর পৌষমেলার সময়েই বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ সমাবর্তন উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। সেই উৎসবে ভাষণান্তে ঐ জটিল অবস্থা তৈরি হয়ে যাচ্ছিল বারবার। বোঝাই যাচ্ছিল: অনুষ্ঠানে উপস্থিত মানুষরা দু' দলের। 'সাধু' ধ্বনিকারীরা বিশ্বভারতীরই আবাসিক ছাত্র-



ছাত্রী, কর্মী কিংবা শিক্ষক; আর হাততালি দেনেওয়ালারা বাইরের লোক যারা বিশ্বভারতীর রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নয়—বরং বিশ্বভারতী ব্যাপারটা যাদের কাছে বেশ মজার।

সমাবর্তনে ঢোকার জন্যে কারডের ব্যবস্থা ছিল, পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকদের কড়াকড়ি ছিল, লোহার জাল দিয়ে নানা দিক ঘিরে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু মনে হয় প্রবেশ পথে কোন চেকিং ছিল না। যে ইচ্ছে ঢুকে পড়েছে এবং আশেপাশের গাছে উঠে মজা দেখতে লেগে পড়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে এই ধরনের একাত্মতা কেউই পছন্দ করেন না বলে গাছ থেকে নেমে আসার জন্য তাদের বারবার অনুরোধ করা হয়; কিন্তু কে শোনে কার কথা।

শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা এখন মোটামুটি যা দাঁড়িয়েছে তা এই সমাবর্তনের ছবি থেকেই কিছুটা আঁচ করা যাবে।

কেউ যদি ধমকান, মশাই এত ধানাই পানাই দরকার কী, আসল কথাটা বলে ফেলুন। তাহলে তার উত্তর হবে: কলকাতা ময়দানে বিড়লা প্ল্যানেটরিয়ামের উল্টো দিকে



যে কোনো বাণিজ্য বা ইনজিনিয়ারিং মেলা কেউ দেখে থাকলে তার আর পৌষমেলা দেখতে যাবার দরকার নেই। অকথ্য ভিড়, সেই একই কলকাত্তাই মুখগুলির সমাবেশ এবং শহুরে কসমোলিটান সংস্কৃতির হুল্লোড়।

যেকোন সময়েই যেখানেই যান না কেন, সাজ-পোশাকের বাহার আর হুমড়ি খেয়ে শহুরে কৃত্রিম জিনিস কেনার জন্য তাড়াহুড়ো, সব সেই একই ছবি। স্টল বলতে প্ল্যাসটিক ও পলিথিনের খেলনাপাতি, চকর-বকর জামা প্যানট, কাশ্মীরী শাল, গুজরাটী চাটনি, চা, কফি, সিঙাড়া, নিমকি, রোস্ট কাটলেট আফগানী কাটলেট, চিকেন কাটলেট, ফিস ফ্রাই, মোগলাই পরটা, শিককাবাব, এগ রোল, ফিস রোল, চিকেন রোল, বইপত্র, ম্যাগাজিন, সিগারেট, চুরুট, গ্রিটিংস কারড, সাইড ব্যাগ, চামড়ার টুপি, ঝুটোমালা, গয়না, ছোলা ভাজা, বাদাম, মুড়ি, ফুচকা, আলু কাবলি, ভেলপুরি, বাটাটা পুরী, দৈ বড়া, পোরসেলিনের কাপ ডিস, ফুলের টব এইসব পরিচিত জিনিসেরই।

এখনকার পৌষমেলাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। রাতে আর দিনে এই মেলার চেহারা পালটায়। দিনের বেলা বীরভূমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঝলমলে রোদ আর সবুজের সমারোহে বিভাসিত হয়। তার মধ্যে লাল ধুলো ওড়ে পায়ে পায়ে। সাজানো গোছানো স্টলের জিনিসপত্রে সেই ধুলো পুরু হয়ে জমে। চারদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ। অত বিস্তৃত স্থানও তখন মনে হয় অকুলান।

রাতে আবার মেলার চেহারা যায় বদলে। তখন শুরু হয় তারস্বরে হিন্দি গান। মাইকে প্রসারিত এই গান দিগবিদিকে ছড়িয়ে যায়।



মেলার মাঠের উত্তর-পূর্ব কোণ ঘেঁসে বসে সারকাস, বেবী ট্রেন, কথা বলা আশ্চর্য পুতুল আর চিড়িয়াখানার আসর। এরা লোক আকর্ষণের শহুরে কায়দাই শ্রেষ্ঠ পথ বলে মেনে নিয়েছে। ছোট্ট চিড়িয়াখানার মাচার ওপর বসানো রয়েছে একটা চায়চে পাখি আর একটা ভারতীয় মর্কট শ্রেণীর বাঁদর। বেচারা প্রচণ্ড শীতে কুঁকড়ে মড়ার মত পড়ে আছে। তারই নিচে হ্যালোজেন আলোর তীব্র চোখ ধাঁধানির মধ্যে প্যারালাল ট্রাউজারস ও বেলবটস শারট পরিহিত আধুনিক যুবাটি ওয়াকি টকি নিয়ে নেচে নেচে কিশোরকুমারের রেকরড-গানের সঙ্গে লিপ দিচ্ছে।

ক্ষুদে চিড়িয়াখানা ও ক্ষুদে সারকাসের ঠিক পাশেই বিপুল বেগে ঘূর্ণিত হচ্ছে বিশালাকৃতি বৈদ্যুতিক নাগরদোলা। তার প্রত্যেকটির খোপে জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে বিজ্ঞাপনসদৃশ্য তরুণতরুণী। দুলে দুলে ঘুরে যাচ্ছে তাদের ববড চুল, চিকন শাড়ি ও ম্যাকস ফ্যাকটার মাখা মোমের মত মুখগুলি। তারই অদূরে ছেঁড়া হাফ প্যানট পরা সাঁওতাল বালকটি ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে মুখে আঙুল পুরে দেখছে সেই মজার যন্তর। তারই মা বেবী ট্রেনের চলমান মজার দিকে কিছুক্ষণ বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছে।

পৌষমেলায় এখন রোজ অনুষ্ঠান বসে গানের, কবির লড়াই-এর, যাত্রার বা কথকতার। সে সব অনুষ্ঠানে ভিড় যাদের হয় তারা বিশেষ কেউ বহিরাগত নন। সবই আশে-পাশের গ্রাম থেকে আসা। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অবাক বিস্ময়ে যাত্রার নায়কের লাফানি ঝাঁপানির দিকে তাকিয়ে আছে। গোগ্রাসে গিলছে তার ডায়লগ। কেউবা কুঁকড়ে শুয়ে পড়েছে, নাক ডাকাচ্ছে নিশ্চিত মনে।

কিন্তু এই মেলাতেই ভিড় যেদিন বেশি হয় বুঝতে হবে কলকাতার কোনো পূর্ণদাস বাউল বা সেই মাপের আর কেউ অনুষ্ঠান পরিবেশন করছেন। এই বাড়তি ভিড় তৈরি করে অবশ্য বহিরাগতরাই। গ্রামীণ ভিড়ের পাশে তাদের বেমানান ভিড় অবশ্য সব সময় থাকে না এই যা রক্ষে।

পৌষমেলার সন্ধ্যেবেলা থেকে শুরু হয় ক্যাসেট রেকরডার ও ফ্লাশ ক্যামেরার মেলা। আর সে মেলা বসে বাউলদের মণ্ডপে। সবাই এখন নতুন নতুন বাউল প্রতিভা অন্বেষণে ব্যস্ত। তাই দিশি বিদেশী ক্যাসেট রেকরডারের ভিড়। বাউল মণ্ডপে ভিড় সবই শহুরে। বিদেশীও থাকেন। কেউ ছবি তুলছেন ফটাফট, টেপ করছেন গম্ভীর ভাবে। কেউবা গাঁজার মৌজে দু'দিনের জন্য বাউলদের ইয়ারদোস্ত বনে গেছেন। আবার সেই শহুরে ফিরে গিয়ে লেজার ঘাঁটা, ক্রেডিট ডেবিট করা কিংবা হিন্দি সিনেমার

একটা টিকিটের জন্য হন্যে হয়ে ফেরা।

অথচ তারই পাশে রয়েছে পীর গাজীদের মণ্ডপ। যেহেতু পীরের গান এখনও পর্যন্ত কোন শহুরে পাবলিসিটি পায়নি তাই সেখানে সামান্যতম ভিড়ও নেই। পীর গাজীরা আপন মনে গান গায় 'আল্লার দোয়া জয়নাল আবেদিন।' কেউ শোনে না সেই গ্রামীণ সুরসমৃদ্ধ, একটি লোহার সঙ্গে আর একটি লোহার পাত বাজিয়ে তালমেলানো সরল গান। মেলা শেষ হবার আগেই সেই পীর গাজীরা কোথায় যেন নীরবে মিলিয়ে যান, পড়ে থাকে শুধু তাদের ফাঁকা মণ্ডপটি।



সাঁওতালদের ক্রীড়া ও শারীর প্রদর্শন এই মেলার একটা বড় আকর্ষণ। মেলার মাঠে দুপুরবেলা খেলা জমে ওঠে। ভিড় সেখানেও বহিরাগতদেরই বেশি। একটি সাঁওতাল বালক কেবলই বদভ্যাস বশে মাঠের মধ্যে থুথু ফেলছে। তার অভিভাবক স্থানীয় একজন এভাবে থুথু ফেলতে বারণ করছে। একজন বুড়ো গোছের মাঝি নিজভাষায় বলে ওঠে, ফ্যাল, থুথু ফেলে ফেলে বাবুদের জায়গা নোংরা করে দে। তার কথা শুনে হো হো করে হেসে ওঠে উপস্থিত সব সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষই।

মেলার শেষদিনে মাঠে বাজি পোড়ানোর ধুম। সে একটা দেখার মতো অনুষ্ঠান। কিন্তু রাশি রাশি বাস আর মোটরকার জমে হয়। সেইসব হঠাৎ আগন্তুক গাড়ির মাথায় চড়ে বসে বেতের টুপি পরা যুবক-যুবতীর দল। পৌষমেলায় এই বাজি পোড়ানো একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাজি আসে কাছেই সুরুল গ্রাম থেকে। টেপা মালির পরিবার এই বাজি তৈরি করে নিজেদের উদ্যোগে এবং [illegible]মত উন্নতমানের।

পৌষমেলায় শহুরে ভিড় শুধু এর চরিত্রের [illegible] ক্ষতিকর তা-ই নয়, পরিবেশকেও অত্যন্ত [illegible] করে তোলে। প্রকাশ্য স্থানে ভাঁড় [illegible] গোল হয়ে ঘিরে বসে যুবকেরা, পচাই খায় আর হুল্লোড় করে। তাছাড়া এখানকার আদিবাসী সাঁওতাল রমণীরা এখন যে কিছু কিছু আদিম ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন তাও এই বহিরাগতদের জন্যই।

সাঁওতাল পাড়ায় যাবার একটা গোপন রেওয়াজ এখন চালু হয়েছে। অনেকেই এখন জেনে গেছে সাঁওতাল পাড়ায় চোলাই মদ ও নারী পাওয়া যায়। পৌষমেলার সময় এই গমনাগমন যেন আরও বেড়ে যায়। যেকোন মেলায়ই যেমন সব ব্যবসার রমরমা, তেমন আদিম ব্যবসারও।

মাঠে থুথু ফেলা নিয়ে সাঁওতালদের যে প্রতিক্রিয়া তা যুক্তিহীন নয় এর থেকেই বোঝা যাবে। একটা ফোঁড়া শরীরে ফুটে উঠেছে মানে রক্তে পচনের আশংকা রয়েছে।

শান্তিনিকেতন বা বিশ্বভারতীর যারা সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী তারা পৌষমেলার এই অধঃপতন এবং সেই সঙ্গে আশেপাশের জনজীবনের অভিযোগ সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন।

বোলপুর এবং তার আশপাশের অঞ্চল চিরকালই সাঁওতাল জনপদ হিসেবে স্বীকৃত। একচ্ছত্র আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হলে পুরনো বাসিন্দা যারা তারা চিরকালই ক্ষুব্ধ ও শঙ্কিত হয়ে ওঠে। এর ওপর নবাগত বা বহিরাগতরা যদি আগ্রাসক ও শক্তিশালী হয় তবে পুরনো বাসিন্দারা সুযোগের অপেক্ষা করে। সে হিসেবে যদি কোনদিন দেখা যায় আশপাশের সাঁওতালদের সঙ্গে বিশ্বভারতীর কোন সংঘাত ঘটেছে তবে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না।

পৌষমেলার আদর্শ এবং বিশ্বভারতীর গঠনের নীতি রবীন্দ্রনাথের কাছে একাত্মভাবে জড়িয়েছিল। শান্তিনিকেতনে প্রত্যেক বছর ৭ পৌষ মেলা বসে। এই তারিখে মেলা বসার একটা ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস অনুধাবন করলে বোঝা যাবে এই মেলার প্রকৃত তাৎপর্য কী।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার পারিবারিক জমিদারী কালীগ্রামে কাজ সেরে কলকাতা ফিরছিলেন। পদ্মায় যাতায়াত তখন ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। বিপুল এক ভৈরবমূর্তি মেঘ আকাশ ছেয়ে ফেলল মুহূর্তে। পদ্মা ফুলে ফুলে উঠছে ঘনঘন। তারই মধ্যে মাঝিরা আর সাহস না করে নদীতীরে নৌকো বেঁধে দিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ বহুদিন বাড়ি ছাড়া। তাঁকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরতে হবে। ফলে মাঝিদের তিনি সেই বর্ষার





মধ্যেই নৌকো ছাড়বার হুকুম দিলেন। মাঝি নৌকো ছেড়ে ঘনঘোর দুর্যোগের মধ্যেই তা পার করে নিয়ে এল। শুধু তাই নয়, অন্যদিক থেকে আসা মাঝিদেরও সে ভরসা দিল, 'ভয় নাই, চলে যান।'

এই নিশ্চিত আত্মসমর্পণ থেকেই দেবেন্দ্রনাথ বুঝলেন ঈশ্বর সর্বত্রগামী এবং তার কোন শরীর এবং প্রতিমা নেই। সেই নৈর্বস্তুক ঈশ্বরের ধারণা তাঁকে রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করল এবং ১৭৬৫ শকের ৭ পৌষ তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন।

এর ঠিক দুবছর পর অর্থাৎ ৬৭-র ৭ পৌষ আরও ৫০০ জন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন। সমস্ত ছড়ানো ছিটোন ব্রাহ্মমতাবলম্বীদের এক জায়গায় নিয়ে আসার ফলে দেবেন্দ্রনাথ ভাবলেন এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য নগরের বাইরে প্রশস্ত ক্ষেত্রে একটা মেলা হলে ভালো হয়। এই উপলক্ষেই পলতার অন্যপারে গোরিটির বাগানে সবাইকে নিমন্ত্রণ করলেন দেবেন্দ্রনাথ এবং নিজে নৌকো ভাড়া করে সেখানে নিয়ে গেলেন।

এখানে সকালবেলা সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মের জয়ধ্বনি আরম্ভ হল। ফলফুল শোভিত বৃক্ষচ্ছায়ায় মুক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের উপাসনা হল।

এই অনাবিল ঈশ্বরপ্রীতির মেলাই পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে স্থানান্তরিত হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই ৭ পৌষকে স্মরণ করে বলেছেন, 'মহর্ষির সেই জীবনের দীক্ষা এই আশ্রম বনস্পতিতে আজ আমাদের জন্য ফলচে, এবং আমাদের আগামীকালের উত্তর বংশীয়দের জন্য ফলতেই চলবে।' তাঁর আরও বক্তব্য, (মহর্ষির ৭ পৌষের) 'দীক্ষা ভিতরে থেকে তাঁর জীবনকে ধনীগৃহের প্রস্তর-কঠিন আচ্ছাদন থেকে সর্ব দেশ সর্ব কালের দিকে উদঘাটিত করে দিয়েছে। এই সেই ৭ই পৌষ এই শান্তিনিকেতন আশ্রমকে সৃষ্টি করেচে এবং এখনও প্রতিদিন একে সৃষ্টি করে তুলচে।'

১৩৬৮ আষাঢ় সংখ্যায় প্রবাসীতে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মী সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'জগতে এমন কবি আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেছেন কি, যিনি একই সঙ্গে যুগপৎ দুই মহাকাব্য সৃষ্টি করে গেছেন?

'বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের অন্যতম মহাকাব্য, ভবিষ্য জগৎ এর জন্যেও তাঁকে চিরকাল স্মরণ করবে। অথেয়ং বিশ্বভারতী। যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম।' এখানে সত্যিই সারা পৃথিবীকে মেলাবার চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। হিন্দু মুসলমান শিখ খৃস্টান পার্শী সকল স্থানের সকল ধর্মের শিক্ষক ও ছাত্রের আগমন হয়েছিল এখানে। জিয়াউদ্দীন, মোফজ্জল হায়দর, সৈয়দ মুজতবা আলী, ব্রহ্মবান্ধব, এনড্রুজ, পিয়ারসন, এলমহার্স্ট সকলে জড় হয়েছিলেন বিশ্বকে এক আধারে সমবেত করার জন্য।

কিন্তু এর চেয়েও এগিয়ে ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতী একটা প্রাচীর তুলে জ্ঞানের আরাধনা করবে, চারপাশের গ্রামগুলির সঙ্গে তার কোন সংযোগ থাকবে না এটা তিনি ভাবতেই পারতেন না। বিশ্বভারতীর জ্ঞানের আলো যাতে আদিবাসী গ্রামগুলিকেও আলোকিত করে তোলে তার জন্য তিনি পাঠভবন, বিদ্যাভবন, শিক্ষাভবন, সঙ্গীতভবন ও কলাভবনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনিকেতনও গড়ে তোলেন।

এই শ্রীনিকেতনে গ্রামের সাধারণ মানুষদের পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দেবার চেষ্টা শুরু হল। শান্তিনিকেতনের তিন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক কালীমোহন ঘোষ, গৌরগোপাল ঘোষ এবং সন্তোষকুমার মিত্র গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য এবং জীবিকার উপায় খুঁজে বের করার জন্য রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক নিযুক্ত হন। পরে এই দায়িত্বভার নেন তরুণ ইংরেজ লিওনারদ কে এলমহার্স্ট।

তখন এই আদর্শ ও রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে ৭ পৌষ শান্তিনিকেতনের মাঠে যে মেলা বসত তারও একটা আদর্শ ছিল। রবীন্দ্রনাথ যে কোন মেলাকেই মিলিত হবার, একে অপরকে জানার সুযোগ বলে মনে করতেন। অথচ কালে কালে এই জানার সুযোগটা নিজেকে জানানোর সুযোগে এসে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্বভারতী ক্রমশ তার আকার বাড়িয়ে চলেছে। কিন্তু আকার বাড়াতে গেলে পাশের গ্রামগুলিতে তাকে ঢুকে পড়তেই হবে। রবীন্দ্রনাথের মহান আদর্শ-লালিত এই বিশ্ববিদ্যালয় তাও করতে বাধ্য হচ্ছে। ফল পরিণতি তখন একটাই—পুরনো বাসিন্দাদের পিছু হটা।

কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হবার পর নানা কারণে এই আকার বাড়ছে ঠিকই কিন্তু সেই সঙ্গে আশপাশের গ্রামগুলিকেও তা অসন্তুষ্ট করে তুলছে। ফলে ভবিষ্যতে বৈরীভাব দেখা দেওয়া অসম্ভব কিছু নয়। সে কারণেই মেলায় ইদানীং সাঁওতাল ও গ্রামীণ মানুষের উপস্থিতি কমে আসছে, বাড়ছে শহুরে মানুষের ভিড়।

তখনকার যারা আশ্রমিক তাদের ম ॥ অনেকেই এখনও জীবিত এবং শান্তিনিকেতনেই বসবাস করেন। তখনকার মেলা সম্পর্কে এই রকম একজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক তাঁর পূর্বপল্লীর বাড়িতে বসেছিলেন চুপচাপ। তিনি আর এখনকার মেলা সম্পর্কে আগ্রহী নন। আগেকার মেলার বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন, সেসব দিন ছিল আলাদা, রবীন্দ্রনাথ নিজে মাঝে মাঝে সেই মেলায় এসে হাজির হতেন, খৃস্টোপাসনার দিন নিজে উপাসনা মন্দিরে ভাষণ দিতেন।

৭ পৌষের মেলায় রবীন্দ্রনাথ প্রায় সময়ই উপস্থিত থাকার চেষ্টা করতেন। একবার সম্ভবত ছিলেন না। সেটা ১৯০৫ খৃস্টাব্দে। তিনি শিলাইদহ থেকেই শুনলেন মহর্ষি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। শিলাইদহ থেকে সোজা রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো চলে যান। মহর্ষি অবশ্য মারা যান ৬ মাঘ। রবীন্দ্রনাথ সে সময়টুকু জোড়াসাঁকোতেই ছিলেন। মহর্ষির মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে গিয়ে সেখানকার দায়িত্বভার পুরোপুরি নিজের হাতে তুলে নেন।

গান্ধীজী যখন মহাত্মা হননি তখন একবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। এই সময়ই তিনি অনুভব করেছিলেন, ভারতবর্ষে কাজ করাটাই একটা বিশেষ কর্ম। এখনকার এই কর্মহীন ছুটির আবহাওয়া তৈরি তখনকার পৌষমেলারও উদ্দেশ্য ছিল না। নিরন্তর জানাবোঝা বা হৃদয়ঙ্গম করাই তার মূলকথা হিসেবে স্বীকার করা হতো। কিন্তু এখন শান্তিনিকেতনের যে পদস্খলন, শ্রীনিকেতনের যে বিচ্যুতি তার সঙ্গে এখনকার পৌষমেলারও এই চারিত্রিক অধঃপতন।

আগেকার সেই কাঠের ছোট ছোট নাগরদোলার জায়গা নিয়েছে বৈদ্যুতিক বিশালাকৃতি নাগরদোলা, আগেকার সেই পাটি বিছিয়ে সাঁওতাল দোকানগুলির জায়গা নিয়েছে ফুট বাই ফুটের ছোট বড় ভাড়া করা স্টল, মাটির হাঁড়িকুড়ি, কাঠের বাসনপত্তর, কাঠের চিরুণি, গোলেকাবলী, সচিত্র প্রেমপত্র আর আরব্য রজনীর জায়গা নিয়েছে চিলড্রেনস বুক ট্রাসটের ঝকঝকে বই। এরা কেউ হারিয়ে গেছে কিংবা সসঙ্কোচে জায়গা করে নিয়েছে মেলার মাঠের শেষে।

পরিবর্তন সব ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক। চরিত্রই যখন বদলে যায় তখন তো তাকে আর পরিবর্তন বলে না। সাঁওতাল ও গ্রামীণ জীবনের ক্রম-পরিবর্তন এই ৭ পৌষের দিনে দেখা যায় না। তা দেখা গেলে এই জীবন-পদ্ধতির ৭৯ বছরের ধারাবাহিকতা বোঝা যেত। কিন্তু সাঁওতাল ও গ্রামীণ জনজীবনই এখানে নেই, বদলে গিয়ে তা দাঁড়িয়েছে শহরেরই এক বিকৃত ও মফস্বলী পরিচয়ে। এটা কেউ কি চেয়েছিলেন? □



আলোকচিত্র : অরূপ দত্ত

# শান্তিনিকেতন ঃ অতীত চিত্র



ছাতিমতলা—অতীতে যেমন ছিল

## চিত্তরঞ্জন দেব

এখন থেকে ৭৯ বছর আগেকার পৌষ সংখ্যা তত্ত্ব-বোধিনীর পাতায় শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয় সম্বন্ধে লেখা আছে ঃ

'মোটের উপর ছেলেরা এখানে আনন্দে থাকে। ঋতুতে ঋতুতে তাহাদের উৎসব হয়, তাহারা সঙ্গীত, অভিনয় প্রভৃতির দ্বারা ঋতুর সম্বর্ধনা করিয়া থাকে। তাহারা বাহিরে পড়ে, তরু-সোদর ও লতা-ভগিনীদের সঙ্গে গায়ে গায়ে মিশিয়া থাকে। গানে, গল্পে, পড়ায়, খেলাধূলায় আমোদ-প্রমোদে তাহাদের আনন্দে দিন কাটে। তাহাদের এই আনন্দই আশ্রমের সকলের চেয়ে বড় লাভ।'

পিতৃদেব মহর্ষির শান্তিনিকেতন আশ্রমে পুত্র রবীন্দ্রনাথ এসে প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে খুললেন 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামে বিদ্যালয় (৭ই পৌষ ১৩০৮ বাংলা)। এর ১০ বছর আগের ৭ পৌষে শান্তিনিকেতনে স্থাপিত হয়েছিল ব্রহ্মমন্দির (১২৯৮)। মন্দির প্রতিষ্ঠার ৪৮ বছর আগের ৭ পৌষে রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন (১২৫০)। ব্রহ্মমন্ত্র-সাধনে সফল হতে পেরেছিলেন বলে দেবেন্দ্রনাথ পরিচিত হলেন মহর্ষি-রূপে। ব্রহ্মমন্ত্র সাধন ছাড়া মনুষ্যত্ব অর্জন করা যায় না। ব্রহ্মমন্ত্র-সাধনের জন্য আশ্রমের প্রয়োজন। শিশুকাল থেকে ব্রহ্মচর্যব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মমন্ত্র-সাধন করতে হয়। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম-বিদ্যালয়।

ব্রহ্মমন্ত্র-সাধন প্রসঙ্গেই মহর্ষির প্রথম পরিচয় হয় ভুবনডাঙার নির্জন প্রান্তরে ছাতিমতলার সঙ্গে। রায়পুরের ভক্ত-জমিদারের কাছে কুড়ি বিঘা জমি নিয়ে তিনি এখানে একটি সুরম্য বাগান ও পাকাবাড়ি রচনা করে তার নাম দেন 'শান্তিনিকেতন' (১৮৬৪)। ব্রহ্ম-সাধনার জন্য মহর্ষি তাঁর শান্তিনিকেতন সর্বসাধারণকে উৎসর্গ করেন (১৮৮৮)। তার পরবর্তী ঘটনার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার ঘটনা।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অধ্যাপক (বঙ্গীয়-শব্দকোষ খ্যাত) হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি ঃ

'৬ পৌষ রবিবারে সকালের গাড়িতে বড়দাদার সহিত শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হইলাম। তখন মাঠের পথে যাতায়াত চলিত। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার আগে আগে এই পথে আসিয়াছিলেন। সকালে ও বৈকালে অনেক মান্যগণ্য ব্রাহ্ম-অতিথি ও মহর্ষির আত্মীয়স্বজন আসিয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অতিথি। সকলকে সমুচিত অভ্যর্থনায় সম্মানিত ও প্রীত করিয়াছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ।...

'আশ্রমের দেবদারুবীথিকার দক্ষিণে একটি সুবৃহৎ তাঁবুতে ও দ্বিতল অতিথিশালায় (বর্তমান শান্তিনিকেতন গৃহ) অতিথিদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল।...

'অতিথিশালায় সংকীর্তন আরম্ভ হইল। বেহালা হইতে আগত কয়েকজন ব্রহ্মবন্ধু-গায়ক মৃদঙ্গযোগে 'প্রাণভরে আজ গান কর, তবে ত্রাণ পাবে, ভবে আর নাহি ভয়'—গান গাহিতে গাহিতে ধীরে ধীরে মন্দিরের পানে



শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

অগ্রসর হইতে লাগিলেন, অন্য অতিথিগণ বিনীতভাবে ভক্তিপূর্বক গায়কদলের অনুসরণ করিয়া মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সংকীর্তন বন্ধ হইল। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠাপত্র লইয়া দ্বারে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি প্রতিষ্ঠাপত্রে লিখিত আশ্রমে উপাস্য-উপাসকের কর্তব্যতা স্বাভাবিক সুস্পষ্ট উচ্চকণ্ঠে পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইলেন। পরে দ্বার উদঘাটিত হইল। মন্দিরে প্রবেশপূর্বক দণ্ডায়মান হইয়া সকলে অর্চনা পাঠ করিলেন। প্রধান আচার্য দ্বিজেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ স্বামীর সহিত বেদীতে আসন গ্রহণপূর্বক উপাসনা সুসম্পন্ন করিয়া তৎকালোচিত বক্তৃতায় সকলের তৃপ্তিসাধন ও প্রতিষ্ঠাকার্য সমাপ্ত করিলেন। পরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সারগর্ভ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় সকলের সন্তোষ সাধন করিয়াছিলেন।...

'রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতে যোগদান করিয়া গীতমাধুর্যে শ্রোতৃগণকে বিমোহিত করিয়াছিলেন।...

'আশ্রমে অবস্থানের সময় মহর্ষি (যে) নিভৃত বেদিকায় উপাস্য অনন্তদেবের ধ্যান-ধারণা করিতেন (সেই) সপ্তপর্ণমূলের স্কন্ধদেশে ধাতুফলকে 'কর তাঁর নাম গান' এই গীতাংশ লিখিত ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ভক্তগণ মন্দিরে উপাসনান্তে এই পবিত্র বেদীমূলে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে কয়েকজন গায়ক ঐ গানটি সম্পূর্ণ গাইয়া সকলকে প্রীত করিয়াছিলেন।...

'বেলা দ্বিপ্রহরে নিমন্ত্রিত অধ্যাপকগণের বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল। ইঁহারা সকলেই উপাসনার সময় উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নমহাশয় যোগ্যতানুসারে পাথেয় ও অর্থদান করিয়া অধ্যাপকগণকে প্রীত ও সম্মানীত করিয়াছিলেন।...

'ক্রমে বেলা অবসান হইলে...সান্ধ্য উপাসনার সময় সমাগত হইল। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রধান আচার্যের কার্য করেন। উপাসনার সময় স্তোত্রপাঠে ও 'অসতো মা সদ্গময়' ইত্যাদিতে সকলে যোগ দিয়াছিলেন।...'

'কলকণ্ঠ কবিবর গায়কদলে যোগদান করিয়া সুললিত গীতমার্গে সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছেন।'

শান্তিনিকেতনে মন্দির প্রতিষ্ঠার পর প্রতি বৎসর সাম্বৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে ৭ পৌষের পুণ্য দিনে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১৮১৭ শক মাঘ) পঞ্চম সাম্বৎসরিকের মুদ্রিত বিবরণে দেখা যায়—

'বীরভূমির সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর, নির্মল প্রভাতকাল, নানারূপ তরুরাজি-বিরাজিত সুপ্রশস্ত উদ্যান, শীতের মৃদুমন্দ সুশীতল বায়ু সমস্তই ব্রহ্মে মন সমাহিত করিবার অনুকূল। সর্বপ্রথম ঘণ্টারব হইল। তখন সকলে ব্রহ্মোপাসনার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অগ্রবর্তী করিয়া মঙ্গল-গীত গাহিতে গাহিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন॥'

'অনন্তর সমস্ত প্রান্তর মুখরিত করিয়া শঙ্খধ্বনি হইল। মন্দির মধ্যে সুপ্রশস্ত ধূপাধারে সুগন্ধি ধূপ প্রধূমিত হইতে লাগিল। পরে আচার্যেরা বেদী গ্রহণ করিলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্তী সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।...'

'অনন্তর সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল। মন্দিরের সোপান-পরম্পরায় বহুসংখ্যক ভোজ্য সুসজ্জিত ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রবাবু তথায় দণ্ডায়মান হইয়া এই বলিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিলেন, অদ্য পৌষ মাসের সপ্তম দিবসে ব্রহ্মপ্রীতিকামনায় এই সমস্ত সবস্ত্র ভোজ্য অনাথ দীন দুঃখী ও আতুরদিগের উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইল।...'

'এ বৎসর প্রার্থীর সংখ্যাও যথেষ্ট হইয়াছিল।...

'দিবা দ্বিপ্রহর। চতুর্দিকে দোকান পসার বসিয়াছে এবং স্থানীয় লোকে উৎসবক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়াছে। ঐ সময় সাধারণের হৃদয়ের সুশিক্ষার উদ্দেশে রাজা শ্রীবৎসের উপাখ্যান গীত হইয়াছিল। সংসারের অনিত্যতা এবং রাজা শ্রীবৎসের ধর্মের জন্য রাজ্যনাশ, স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত বিচ্ছেদ, এবং দ্বাদশ বৎসর বনবাস প্রভৃতি দারুণ কষ্ট অবিচলিতভাবে সহ্য করা, এই সমস্ত করুণরসোদ্দীপক গীতাভিনয়ে অনেকেরই অশ্রুপাত হইয়াছিল।...'

'অনন্তর রক্তসন্ধ্যায় আকাশ সুরঞ্জিত এবং রক্তাভ সূর্য প্রান্তরের পশ্চিম প্রান্তে অস্তমিত হইল। বিচিত্রবর্ণের কাচনির্মিত বিশাল ব্রহ্মমন্দির আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়া অপূর্ব শ্রী ধারণ করিল। সকলে পুনরায় ব্রহ্মোপাসনার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করলেন।...'

পঞ্চম সাম্বৎসরিকের বিবরণে দোকান-পসারের উল্লেখ প্রমাণ করে যে, ওই সময় থেকে শান্তিনিকেতনে ৭ পৌষের মেলার সূত্রপাত। শান্তিনিকেতনের নবম সাম্বৎসরিক উৎসবেও অনুরূপ মেলার পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। ১৮২১ শকের মাঘ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী নিম্নোক্ত চিত্র তুলে ধরেছেন :

'রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসিল। মঠধারী স্বামীজী প্রকাণ্ড ঘণ্টারব সহকারে ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। ধূপধূনার সুগন্ধ আশ্রমপ্রদেশ আমোদিত করিয়া তুলিল। আমরা দলবদ্ধ হইয়া সমস্বরে 'অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি' এই বন্দনাগীতি গাহিতে গাহিতে নানাজাতীয় পুষ্পবৃক্ষে সুশোভিত পথ দিয়া সর্বাগ্রে ব্রহ্মমন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলাম।'

নবম সাম্বৎসরিকের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান আশ্রমে ব্রহ্মবিদ্যালয়-গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন। প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন : 'এবারে উদ্যানভূমিতে ইষ্টকনির্মিত সুপ্রশস্ত একটি

গৃহ ( বর্তমান—পাঠভবন ) দেখিতে পাইলাম। তাহা ব্রহ্মবিদ্যালয়। তাহার সোপানে পূর্ণকুম্ভ। নানাবিধ পত্রপুষ্পে তাহার শ্রীসৌন্দর্য আরও বর্ধিত হইয়াছে। ঐদিন ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের জন্য গৃহ প্রতিষ্ঠা হইবে। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর উহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে এইরূপ কহিলেন ঃ

'প্রভাতে ঈশ্বরোপাসনা সমাপন করিয়া আমরা এক্ষণে এই ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এখানে সমাগত হইয়াছি। এদেশে ব্যায়াম-শিক্ষার স্থান আছে, জ্ঞান-শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়াদি আছে, কিন্তু যেখানে অধ্যাত্মবিদ্যা অধীত হইতে পারে, এরূপ কোন স্থান নাই। সেইজন্যই এই অনুকূল স্থানে এই ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হইতেছে। ঈশ্বরের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া আমি এই ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রমুক্ত করিয়া দিলাম।…

'আবার কীর্তন করিতে করিতে সকলে সপ্তপর্ণমূলে উপস্থিত হইলাম। তথায় প্রস্তরনির্মিত একটি সাধনবেদী আছে। বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবামাত্র যেন এক মহাপুরুষকে দেখিতে পাইলাম। মনে মনে তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্বক সমস্বরে সকলে 'কর তাঁর নাম গান' এই গানটি গাহিতে লাগিলাম।…

'এদিকে যাত্রাভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। অভিনয়ের বিষয় কবিগুরু বাল্মীকি। আমরা অনেকক্ষণ দেখিতেছিলাম।…

ঐ সময় উদ্যানের বহিঃপ্রদেশ লোকে লোকারণ্য। নানাবিধ দোকানপসার বসিয়াছে। উদ্যানের ভিতর স্বামীজী একস্থলে দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার চতুর্দিকে লোক। তিনি সাধারণে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতেছেন।…

মন্দির-প্রতিষ্ঠার একাদশ সাম্বৎসরিকের বিবরণে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লিখেছেন ঃ

'…সাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত ও সঙ্গীত হইলে অনাথ দীনদরিদ্রদিগের জন্য প্রভূত অন্ন-বস্ত্র উপসর্গ করা হইল। পরে সংকীর্তন —'দয়াময় দীনবন্ধু, চাহ করুণা নয়নে…'

'পরে আমরা মেলা দেখিবার জন্য বহির্গত হইলাম। খুব জনতা। বেশ ক্রয়-বিক্রয় চলিতেছে। বাউল সম্প্রদায় নৃত্যগীত করিতেছে। চারিদিকে যেন আনন্দের বাজার। আমরা এই জনতা ভেদ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলাম। তথায় অতি অপূর্ব দৃশ্য। কতকগুলি বালক ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করিয়া বিনীতভাবে উপবিষ্ট হইয়াছে। আমরাও ব্যাপার দেখিবার জন্য বসিয়া গেলাম। দেখিলাম সর্বপ্রথমে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু বলিলেন। পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবদিগকে নিম্নোক্ত প্রকারে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করিলেন—

'ওঁ নমো ব্রহ্মণে। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।…

'ব্রহ্মকে নমস্কার। ঋত বলিব। সত্য বলিব। তিনি আমাকে রক্ষা করুন। তিনি বক্তাকে রক্ষা করুন। আমাকে রক্ষা করুন। বক্তাকে রক্ষা করুন।…

'আমার নিকট ব্রহ্মচারিগণ আসুন। ব্রহ্মচারিগণ দম সাধন করুন। ব্রহ্মচারিগণ শম লাভ করুন। আমি যেন লোকে যশস্বী হই। আমি যেন ধনবান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হই। হে ব্রহ্মের ঐশ্বর্য, তুমি আমাতে প্রবেশ কর। হে ব্রহ্মের ঐশ্বর্য, সহস্রশাখা যে তুমি তোমাতে আমি আপনাকে পবিত্র করি। জল যেরূপ নিম্নস্থানে যায়, হে বিধাতঃ সেইরূপ ব্রহ্মচারিগণ সর্বদিক হইতে আমার সমীপে আসুন। তুমি আশ্রয়, আমাকে আলোকিত কর, আমাকে অধিকার কর।'…

ব্রহ্মচারিগণ সম্মুখে উপনীতে হইলে কহিলেন, 'সহ নৌ যশঃ সহ নৌ ব্রহ্মবর্চ্চসম্। আমরা একত্রে যশলাভ করি, আমরা একত্রে ব্রহ্মতেজ প্রাপ্ত হই।'

ব্রহ্মচারিগণ কহিলেন, 'হে ব্রহ্মপতে, আমি ব্রতপালন করিব। তোমার নিকট প্রার্থনা করি যেন আমি সমর্থ হই। আমি যেন অসত্য হইতে সত্যে উপনীত হই। আমার শরীর উপযুক্ত হউক। আমার জিহ্বা অত্যন্ত মধুরভাষিণী হউক। আমি যেন কর্ণে বহু শ্রবণ করি। যে জ্ঞানের কথা শ্রবণ করিব তাহা যেন রক্ষা করিতে পারি। ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে আচার্য ও শিষ্যকে রক্ষা করুন। তিনি আমাদের উভয়কে ভোগ করুন। আমরা উভয়ে যেন বীর্য প্রাপ্ত হই। আমাদের উভয়ের জ্ঞান অধীত হউক। আমরা পরস্পরকে যেন বিদ্বেষ না করি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।'

পরে ছাত্রগণের প্রতি এই উপদেশ দিলেন ঃ 'হে সৌম্য মানবকগণ, অনেককাল পূর্বে আমাদের এই দেশ, এই ভারতবর্ষ সকল বিষয়ে যথার্থ বড় ছিল—তখন এখানকার লোকেরা বীর ছিলেন। তাঁহারাই আমাদের পূর্বপুরুষ। তাঁরা বড় হয়েছিলেন কি গুণে? তাঁরা সত্যকে সবচেয়ে বড় বলে জানতেন—মিথ্যার কাছে তাঁরা মাথা নিচু করেননি। সত্য কি তাই জানবার জন্যে সমস্ত জীবন তাঁরা কঠিন তপস্যা করতেন। তাঁরা অভয় ছিলেন, ধর্ম ছাড়া আর কিছুকে ভয় করতেন না। তাঁরা সকলের মঙ্গলের জন্য ভালর জন্যে চিন্তা করতেন। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিরূপ শিক্ষা ও ব্রত অবলম্বন করতেন? তাঁরা বাল্যকালে গৃহ ছেড়ে নির্জনে গুরুর বাড়িতে যেতেন। সেখানে খুব কঠিন নিয়মে নিজেকে সংযত করে থাকতে হত। গুরুকে একান্তমনে ভক্তি করতেন, গুরুর সমস্ত কাজ করে দিতেন। গেরুয়া বস্ত্র পরতেন, কঠিন বিছানায় শুতেন, পায়ে জুতো নেই, মাথায় ছাতা নেই, সাজসজ্জা বড়মানুষী কিছুমাত্র নেই। সমস্ত মনের সমস্ত চেষ্টা কেবল শিক্ষা লাভে, কেবল সত্যের সন্ধানে, কেবল নিজের দুষ্প্রবৃত্তি দমনে, নিজের ভাল গুণকে ফুটিয়ে তুলতে নিযুক্ত থাকত। তোমাদের সেই রকম কষ্ট স্বীকার করে সেই কঠিন নিয়মে, সকল প্রকার বড়মানুষীকে তুচ্ছ করে দিয়ে এখানে গুরুগৃহে বাস করতে হবে। আজ থেকে তোমরা সত্যব্রত গ্রহণ করলে। আজ থেকে তোমাদের অভয়ব্রত। আজ থেকে তোমাদের পুণ্যব্রত। আজ থেকে তোমাদের মঙ্গলব্রত। এক কথায় আজ থেকে তোমাদের ব্রহ্মব্রত। এক-ব্রহ্ম তোমাদের অন্তরে বাহিরে সর্বদা সকল স্থানেই আছেন। প্রত্যহ অন্তর একবার তাঁকে চিন্তা করবে। তাঁকে চিন্তা করবার মন্ত্র আমাদের বেদে



শালবীথিতে অতীত দিনের ক্লাস

আছে। সেই মন্ত্র, হে সৌম্য, তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে একবার উচ্চারণ কর—

'ওঁ ভূ ভুর্বঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো-দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ'। ইহার পরে বক্তা গায়ত্রী মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিলেন।

ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিল। সুপ্রশস্ত কাচনির্মিত ব্রহ্মমন্দিরে আলোক জ্বলিয়া উঠিল। উপাসনার শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি বেদি গ্রহণ করিলে চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় গম্ভীর স্বরে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

শান্তিনিকেতনে মন্দির প্রতিষ্ঠার একাদশ সাম্বৎসরিক উৎসবের সূচনায় ( ১৯০১ খৃস্টাব্দ ৭ পৌষ ) মহর্ষির আশ্রমে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়—পাঁচজন বালক ব্রহ্মচারীকে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে শিক্ষকের সংখ্যাও পাঁচ। তাঁর মধ্যে দুইজন ছিলেন

উপাসনান্তে কবি ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে এখানে এসে প্রতিদিন গান করতেন। পিতার কাছে পুত্রের মত কবির দুই পাশে দণ্ডায়মান গায়ক বালক শ্রেণীর এই মনোরম দৃশ্য এখনও প্রত্যক্ষবৎ মনে পড়ে।···

'ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় কবির অর্থকৃচ্ছ্র ছিল সমধিকই। ব্যয়নির্বাহার্থ পুরীস্থিত পাকাবাড়ি তিনি বিক্রয় করেন। কবিপত্নীও সহায়তা করেন অলঙ্কার বিক্রয়ের অর্থ দ্বারা।

অধ্যাপক হরিচরণ বলেছেন: 'প্রাচীন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সর্ব বিষয়ের অনুসরণে কবির আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কাল পরিবর্তনশীল, কোন নিয়মই চিরন্তনভাবে অপরিবর্তিত থাকে না, পরিণামদর্শী কবি তাই কাল, দেশ ও পাত্রের বিচারাশ্রয়েই প্রাচীন নিয়মের কিছু পরিবর্তন কিছু পরিগ্রহণ করে আশ্রমের নিয়মাবলী প্রবর্তন করেছিলেন।···

'ঘরের মধ্যে অধ্যাপনার শিক্ষা-পদ্ধতি কবির অভিপ্রেত ছিল না। তাই আশ্রমে পৃথক অধ্যাপনাগৃহ নির্মিত হয় নাই। গাছের

শয়নের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে বিদ্যার্থীগণ কুটিরে বড় একটা থাকেন না। আশ্রমের চারিদিকে বড় বড় ছায়াময় গাছ—আম, জাম, বকুল, মহুল, নিম, পেয়ারা, শেফালি ও দেবদারুবীথিকা—ছেলেরা নিজের হাতে সেই সকল বৃক্ষনিম্নে বেদিকা রচনা করিয়াছে। বর্ষাকাল এবং উত্তপ্ত গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্ন ব্যতীত অন্য সকল সময়েই সেই তরুচ্ছায়াতলে ক্লাস বসে। প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য স্নান, উপাসনা, প্রাতরাশ ও মন্ত্রোচ্চারণের পরেই ক্লাস, প্রায় ৭৷৷ টার সময়, দ্বিপ্রহরে আহারের পর কিছুকাল বিশ্রামান্তে পুনরায় ক্লাস বসে এবং বৈকালের জলযোগের পূর্ব পর্যন্ত ক্লাস চলিতে থাকে। সুতরাং কুটিরে বাস অপেক্ষা প্রকৃতির সহবাস ছাত্রদিগের অধিক পরিমাণে ঘটিয়া থাকে।....

'প্রভাতে অপরাহ্নে বালকগণ এই কুটিরগুলি নিজের হাতে ঝাঁট দেয় ও নিজ নিজ স্থান পারিপাটীরূপে পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখে। প্রত্যেক কুটিরেই বালকদিগের ভার গ্রহণ করিয়া একজন অধ্যাপক থাকেন।···



শান্তিনিকেতন মন্দিরে ব্রহ্মোপাসনায় সমবেত ছাত্র-অধ্যাপক-অতিথি

সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং তাঁর খৃস্টান শিষ্য রেবাচাঁদ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'এই কারণে অধ্যাপনার আর্থিক ( দায় ) ও কর্মভার লঘু হয়েছিল তাঁদের দ্বারা।'

কিন্তু এই দুই সন্ন্যাসী বেশিদিন ছিলেন না শান্তিনিকেতনে। বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে খুবই বেগ পেতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে নানা সময়ে। কিন্তু তিনি হাল ছেড়ে দেননি। তাঁর জীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ও বিকশিত হয়ে উঠেছে নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অধ্যাপক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন: 'প্রারম্ভে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সংগতি ছিল স্বল্পই। তিনটি ছোট ঘরে ইহা তখন বিভক্ত ছিল। পূর্ব-প্রান্তের ঘরে থাকতেন মনোরঞ্জন। জগদানন্দ, সুবোধচন্দ্র, নরেন্দ্রনাথ ছিলেন পরবর্তী মাঝের ঘরে। শেষ ঘরটি ছিল বেশ দীর্ঘ। ইহার আড়দেয়ালের পাশে লেখকের স্থান ছিল। ছাত্রেরা থাকত অবশিষ্ট অংশে। ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল এই ঘরে আমার নিকটে থাকতেন। ইনি বিদ্যালয়-কার্যের পরিদর্শক-অধ্যক্ষ ছিলেন। ইহার উত্তরদিকের দেয়ালের কাছে একটি ছোট 'টেবল হারমোনিয়ম' ছিল। সন্ধ্যার

তলায় আসনে বসে অধ্যাপক পড়াইতেন, ছাত্রেরা পড়িত। ইহাতে একদিকে যেমন প্রাচীন প্রথার অনুসরণ ছিল তেমনই পক্ষান্তরে সাধারণ বিদ্যালয়ের মত চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চের ব্যয়বাহুল্য ছিল না।···

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বয়স যখন এগারো বছর তখনকার শান্তিনিকেতনের নিম্নোধৃত চিত্রটি পাওয়া যায় তত্ত্ববোধিনীর পাতায়:—

'পূজাবকাশের পর গত ১৫ কার্তিক আশ্রম খুলিয়াছে। ছাত্রসংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে এবার প্রায় ১৭৫টি ছাত্র হইয়াছে।...

'শান্তিনিকেতনের দক্ষিণ সীমান্তে শালতরুশ্রেণীর দুইধারে আশ্রমের কুটিরগুলি পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে বরাবর চলিয়া গিয়াছে। কুটিরগুলি প্রশস্ত লম্বা ঘর, মেজে বাঁধান, উপরে খড়ের কিংবা টালির ছাদ। প্রায় প্রত্যেকটিতেই ২০।২৫টি করিয়া বিদ্যার্থী বাস করে। দুই সারি খাট এবং প্রতি খাটের নিকটে দেয়ালের সঙ্গে সংলগ্ন পুস্তক রাখিবার একটি তাক, ইহা ভিন্ন অন্য কোন আসবাববাহুল্য কোন কুটিরেই নাই। ···উত্তর দক্ষিণ খোলা···আলো বাতাস অপর্যাপ্ত।···

দ্বিপ্রহরে ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম ও রাত্রে

'ছাত্র বাড়িয়া যাওয়াতে কর্মের সুবিধার জন্য ছাত্রগণকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—আদ্য, মধ্য এবং শিশু। বিভাগের পরিচালনার জন্য অধ্যাপকগণ প্রতি বিভাগেই এক বৎসরের মত এক একজন অধ্যক্ষ নির্বাচন করিয়া থাকেন। সমস্ত আশ্রমের জন্য একজন অধ্যক্ষ প্রতি বৎসরে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। আশ্রম সম্বন্ধীয় সকল বিষয়েই তাঁহার কর্তৃত্ব থাকে। তাঁহার সঙ্গে পঞ্চজন সভ্যবিশিষ্ট একটি কার্য-নির্বাহক সভা আছে। এই সভার সভ্যগণও প্রতি বৎসর নির্বাচিত হইবেন। প্রতি কুটিরের ছাত্রগণ নিজেদের চালনার ভার নিজেরাই গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে একজন নায়ক নির্বাচন করে এবং সর্ব বিষয়ে তাহার আদেশ পালন করিয়া থাকে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'আমাদের দেশে বিদ্যা শিক্ষার আয়োজন কঠিন ও কঠোর, যখন দেখলুম শিশুচিত্ত বিদ্যার নামে বন্দী হয়ে আছে তখন মন ব্যাকুল হল, যাতে করে শিশুর দুঃখ দূর হয়, অধ্যাপকের স্নেহে কল্যাণে অভিষিক্ত হয়ে মুক্ত সমীরণে শিক্ষালাভ করতে পারে, এখানে তার ব্যবস্থা হল।'

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় শান্তিনিকেতনে

তৎকালের পড়াশোনা সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ 'ইংরাজী, অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল অন্যান্য বিদ্যালয়ের ন্যায় শিক্ষা দেওয়া হয়, অতিরিক্ত কেবল বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। যে ছাত্র যে বিষয়ে যতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাকে ঐ বিষয়ে তদনুরূপ বর্গে ভর্তি করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়।'

এই ব্যাপারটি পরিষ্কার করে বলেছেন আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র প্রবীণ অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মহাশয় ঃ 'তখনকার দিনে শান্তিনিকেতনে একই ছেলে শিক্ষার তারতম্য অনুসারে এক এক বিষয় উচ্চতর বা নিম্নতর শ্রেণীতে পড়িতে পাইত। কোন ছেলে বাংলা ইংরেজিতে হয়ত সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে, গণিতে সে অষ্টম শ্রেণীভুক্ত। বছর শেষে সব বিষয়ে যাহাতে সে ষষ্ঠ শ্রেণীর উপযুক্ত হইতে পারে, সেদিকে কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি রাখিতেন। কাল্পনিক দৃষ্টান্ত খাড়া করিয়া লাভ কি, আমি নিজেই এইরূপ বিচিত্র শ্রেণীর একজন ছাত্র ছিলাম। গণিতে আমি বরাবর এক শ্রেণীর নিচে পড়িতাম। বছর শেষে আমাকে সব বিষয়ে সমান পারদর্শী করিয়া তুলিতে কর্তৃপক্ষের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না।'

এখানে শ্রেণী বলিতে 'বর্গ' বোঝায়। প্রচলিত ক্লাস এইট, ক্লাস সেভেন, বা ক্লাস সিকস-এর সঙ্গে উল্লিখিত বর্গের মিল নেই। প্রথম শ্রেণী বা বর্গ বলতে ক্লাস টেন বোঝায়। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় শ্রেণী বলতে ক্লাস নাইন, তৃতীয় শ্রেণী বলতে ক্লাস এইট, চতুর্থ শ্রেণী বলতে ক্লাস সিকস এবং দশম শ্রেণী বলতে ক্লাস ওয়ান বোঝায়।

'শান্তিনিকেতনে জীবহিংসা নিষিদ্ধ। বালকগণ নিরামিষ খাইয়া থাকে বলিয়া এখানে একটি গো-মহিষ শালা আছে। কিয়ৎ পরিমাণে দুধ হইতে মাখন তুলিয়া ঘি করা হয় এবং তাহা পাতে খাইতে দেওয়া হয়।' —(তত্ত্ববোধিনী)।

আশ্রমে সমস্ত ব্যবস্থাই রাখা হয়েছিল। রোগীদের জন্য একটি ঔষধালয় ও হাসপাতাল ছিল বর্তমান তিন-পাহাড়ের কাছে। তখন না ছিল বিজলী আলো, না ছিল জলের কল। অধ্যাপক বিশী বলেছেন ঃ 'রবি নামে এক ভৃত্য লণ্ঠন সাজাইয়া সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঘরে দিয়া আসিত।'

তখন ঘরে ঘরে জলের কল ছিল না।

'আশ্রমে ইতস্তত কয়েকটি গভীর ইঁদারা ছিল। পশ্চিমী পালোয়ান-চাকরেরা জল তুলিয়া চৌবাচ্চা ভরিয়া রাখিত—ভোর বেলা স্নান করিতে হইবে। মেটে কলসীতে করিয়া জল লইয়া ছেলেদের ঘরে ঘরে রাখিয়া আসিত —পান করিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে ইঁদারার জল শুকাইয়া যাইত—কোনক্রমে পানের জলটা মাত্র পাওয়া যায়। তখন আমরা সকলে দল বাঁধিয়া ভুবনডাঙার জলাশয়ে স্নানের জন্য যাইতাম। কিংবা যখন ইঁদারার জলেই অত্যাবশ্যক হইত তখন ছেলের দলের সঙ্গে তাহাদের কাপ্তেনরা দাঁড়াইয়া থাকিত, জল রেশন করিয়া দিত। বলিত, 'কেহ পাঁচ মগের বেশি জল লইতে পারিবে না।' মাঝে মাঝে হুঁশিয়ার করিয়া দিত—'তোমার তিন মগ হইল, তোমার আর দুই মগ পাওনা আছে।' তখন অনেকে আবার বড়-আকারের মগ আমদানি করিয়া আইন ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু কাপ্তেনরা বড় সহজ লোক নয়, তাহারা নানা রকমের নজির দেখাইয়া মগের আকার নির্দিষ্ট করিয়া দিত। এই সব কাপ্তেনদের আমরা বড় ভয় করিতাম।'

অধ্যাপক বিশী আরও বলেছেন ঃ 'এখানকার গণতন্ত্রের দিনে সকলের সকল প্রতাপই কমিয়াছে, বোধ করি কাপ্তেনদেরও আর সে প্রতাপ নাই, কাজেই এখানকার ছেলেদের স্বাধীনতা আমাদের চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি। আর শুধু স্বাধীনতাই বা কেন, এখনকার শান্তিনিকেতনিকদের সুখসুবিধা আমাদের সময়কার চেয়ে অনেক বেশি।

'কিন্তু অতীতের সুখ দুঃখের পরিমাপ প্রায়ই বস্তুর দ্বারা হয়, বস্তুর অভাব রসের দ্বারা পূরণ করিবার শক্তির উপরেই সুখ দুঃখ নির্ভর করে। তখন আমরা কত দীন ছিলাম, কিন্তু তৎকালীন আবহাওয়ার প্রসাদে জীবনের প্রাচুর্যে সে দীনতা আমাদের চোখে পড়িত না, বরঞ্চ বস্তুর দীনতা জীবনরসের দ্বারা পূরণ করিতে গিয়া জীবন যেন সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিত।

'এখনকার শান্তিনিকেতনিকদের সঙ্গে হয়তো এ বিষয়ে মতের মিল হইবে না। ইহাই স্বাভাবিক, তাহারা তাহাদের কালকে ভালোবাসিবে, আমরা যেমন আমাদের কালকে বাসিতাম।'

'এক বিষয়ে শান্তিনিকেতনের আধুনিক ছেলেদের উপরে আমাদের জিৎ ছিল। আমরা রবীন্দ্রনাথের যে-সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম পরবর্তীকালের ছেলেরা তাহা পায় নাই। ছেলেদের কাছে থাকিবার জন্য কবি তখন নতুন বাড়ির (সংলগ্ন) দোতলায় থাকিতেন—এখন যার নাম দেহলি-ভবন। কিন্তু ইহাতেও সন্তুষ্ট না-হইয়া তিনি ছেলেদের একটি ঘরেই বসিবার জায়গা করিয়া লইয়াছিলেন। এখানে বসিয়া সারাদিন তিনি লেখাপড়া করিতেন। এক একদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি এক একটি ঘরে ঢুকিয়া পড়িতেন। নানা রকম নতুন খেলা তিনি উদ্ভাবন করিতেন।

'দু-একটা খেলা আমার মনে আছে। ইহাকে মিলের খেলা বলা যাইতে পারে। একটা শব্দ তিনি মনে মনে ভাবিতেন। তাহার অনুরূপ মিল বলিয়া প্রশ্ন করিয়া মূল শব্দটি বাহির করিতে হইত। হয়তো তিনি মনে করিলেন 'ঘর'। তিনি বলিলেন শব্দের সঙ্গে 'খর' শব্দটার মিল। এখন আমাদের অনুরূপ মিল বলিয়া আসল শব্দটিকে আবিষ্কার করিতে হইত। অনেক সময়ে আমরাও ঐ রূপ একটি শব্দ ভাবিতাম। তিনি প্রশ্ন করিয়া অনায়াসে মিলটা বাহির করিয়া ফেলিতেন। সব সময়ে যে পারিতেন এমন নয়।

'আর একটি খেলা ছিল—তিনি কবিতার একটা ছত্র বলিতেন, তাহার সঙ্গে মিল দিয়া অর্থের সঙ্গতি রাখিয়া দ্বিতীয় ছত্র আমাদের বলিতে হইত। অধিকাংশ সময়ে আমাদের হাতে পড়িয়া হয় মিলটা দ্বিতীয় শ্রেণীর হইত, নয়তো অর্থের সঙ্গতি থাকিত



বটগাছতলায় প্রথম স্টেজ (ছাতাকার চালা)
এর তলায় রবীন্দ্রনাথ ক্লাস নিতেন

না। এখনো তাহার রচিত গোটা দুই ছত্র আমার মনে আছে। একটা নদী-পারাপারের বর্ণনা চলিতেছিল—নদীর স্রোতে আমাদের মিলের নৌকা বানচাল হইবার উপক্রম হইলে তিনি বলিয়া গেলেন—

'সে কি পাড়ি দিল এই ভাদ্দরে ?
ও বাবা কার সাধ্য রে !'

'আবার অনেক সময় তিনি একটা গল্পের সূত্রপাত করিয়া আমাদের চালাইয়া লইতে বলিতেন। বলা বাহুল্য, আমাদের দু'এক ধাপ পরেই গল্পটা ভুতুড়ে ধরনের হইয়া উঠিত, তখন তিনি ভূত ছাড়াইয়া গল্পটাকে সঙ্গত পরিণামে পৌঁছাইয়া দিতেন।

'ইহা ছাড়া মাঝে মাঝে নিজের কবিতা পড়িয়া শুনাইতেন। সন্ধ্যাবেলায় যখন যে বাড়িতে তিনি থাকিতেন, নতুন গান শিখাইবার আসর বসিত। শিক্ষার্থী ও শ্রোতা কাহারো সেখানে প্রবেশ নিষেধ ছিল না।

'এ সব ছাড়া ছেলেদের নানা রকমের ছোট বড় সভায় তিনি নিয়মিত আসিতেন। ছোট কথাটি নিরর্থক, কারণ যে সভাতে তিনি আসিতেন তাহাই বিরাট আকার ধারণ করিত।' ☐



চিরায়ত অলঙ্কার ভূষিতা আধুনিকা 'আও' রমণী

# নাগারা সমতলে এলে বলেন—তোমাদের ভারতে এলাম

মানসরঞ্জন সেনগুপ্ত

সুনীল সবুজ পাহাড়, প্রকৃতির অকৃপণ ঔদার্য ও বন্যরম্যতার আবেশজাত আনন্দের সঙ্গে পার্বত্য ও সমতলবাসীর সহজ মিলন-জনিত আনন্দের সমন্বয় যতদিন না হচ্ছে বৃহত্তর ভারতবর্ষ ততদিনই অস্পষ্ট—অসার্থক। ওই সমন্বয়টাই হচ্ছে না, যেন হবার নয়। মনোরম নাগাভূমির মানুষ সমতলে এসে নামামাত্র বলেন, 'তোমাদের ভারতে এলাম।' কথাটার মধ্যে সত্য অনেকটা লুকিয়ে। তাই তো নাগাল্যানড যেতে হলে যে কোনো সমতলবাসীকে সংগ্রহ করতে হয় Inner line pass. অতিক্রম করতে হয় বহু দুস্তর বাধা, বিবিধ ক্লেশকর পরিস্থিতি। স্বাধীন ভারত-ভূখণ্ডের এক প্রান্তের মানুষের অন্য প্রান্তে যেতে হলে এইভাবেই কি দিনের পর দিন 'নিষেধের ডোর' ছিন্ন করতে হবে? বিঘ্ন ঠেলতে হবে? অপরিচয়ের, অবিশ্বাসের মেখলা তাই তো সরে না। তাই তো শুনতে হয় 'তোমাদের ভারত'! অথচ—

ডঃ টি আও, ডঃ সেঙ্কা আও বৃহত্তর ভারতবর্ষেরই প্রতিনিধিত্ব করেছেন, করছেন। ভারতের এখানে ওখানে বিশিষ্ট স্থানগুলিতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নাগা তরুণ-তরুণীরা নিজেদের জীবন গড়ে তুলবার সাধনায় মগ্ন। ভুলটা তবে কোথায়? আবার, নাগাভূমির মানুষ যেখানে এসে বলছেন, 'তোমাদের ভারত', সেখানকার মানুষই সম্প্রতি প্রচণ্ড ক্ষেপে উঠেছেন—'গো ব্যাক ইনডিয়ান ডগস ফ্রম দ্য ল্যানড অব আসাম'! মনোরম সবুজের উষ্ণতা ও ঔজ্জ্বল্য নিমেষে বিষণ্ণ ও পাঁশুটে হয়ে যায়।

কিন্তু এই নাগাভূমির মানুষই একদা আজাদ হিন্দের সর্বাধিনায়ক নেতাজীকে সাধ্য-মত সাহায্য করেছিলেন। নাগা সর্দার রাজা কলবেল নিজের বাড়িতে নেতাজীকে আপ্যায়ন করেছিলেন; বলেছিলেন, 'ব্রিটিশ বা জাপানী কাউকেই আমরা চাইনে, চাই নেতাজীকে। তিনি তো আমাদেরও রাজা।'

'একটি ধানের শীষের উপরে একটি শিশির-বিন্দু', সেই মধুময় অতীত আজ সন্দেহ-অবিশ্বাস-অপরিচয়ের প্রভাবে ক্রমশ ঝাপসা, শুষ্ক। তাই বুঝি ফিজো অনড়-অটল-অপরিবর্তিত।

স্বাস্থ্য সৌন্দর্য ও উল্লাসে ভরপুর নাগা-ভূমির সাতটি জেলার অন্যতম মনোরমা মোককচংও ওই সব রোগের প্রভাবমুক্ত নয়।



পুলিশ পয়েনট, ডানদিকে বাস টারমিনাস, চার্চ, পেছনে ডি. সি. হিল · দেবপদ চৌধুরী

গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে, জাতিতে-জাতিতে প্রায়শই সংঘর্ষ ঘটলেও, কিছুদিন আগে জেলা সদর মোককচংয়ে যেমনটা হয়েছে জেলার প্রধান অধিবাসী আও এবং সংখ্যালঘু সেমাদের মধ্যে, —একটি ব্যাপারে এঁরা ঐক্যবদ্ধ। সেটি 'বিদেশী বিতাড়ন'।

সমতলের 'ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া', সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র 'পনেরশ' মিটার উচ্চতায় নাগাভূমির উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থিত মোককচং জেলা। জাপুকং, জাংপেৎকং, আসেৎকং, লাংপাংকং ও ওংপাংকং—এই পাঁচটি পাহাড় নিয়ে হিমালয় পর্বতশ্রেণীর উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ১৪০০ কিলো মিটার জুড়ে বিস্তৃত এই জেলার চিত্ততলে জাগ্রত কম্পন। পরিশ্রমী কর্মঠ ও সদাপ্রফুল্ল মানুষেরা এক হাজার থেকে দেড় হাজার মিটার উচ্চতায় বসবাস করেন।

জেলার একটিমাত্র শহর এবং তা জেলা-সদর মোককচং। ছোট্ট সমৃদ্ধ ও সুন্দর। তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরীর উচ্ছলতা ও অট্টহাসিতে ভরপুর। সমতলবাসীর কাছে এ শহর Paradise of Nagaland.শহরের D. C. Hill-য়ে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার আবহাওয়ায় দৃষ্ট হয় সুদূরের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য—ভিন্ন ভিন্ন সুনীল সুন্দর পাহাড় এবং পাহাড়ের মাথায় আলংকিমা, ইমপুর, উংমা প্রভৃতি ছোট ছোট গ্রাম। কেউ কেউ বলেন খুব স্পষ্ট আবহাওয়া থাকলে আসাম উপত্যকায় সুতোর রেখায় প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদও দেখতে পাওয়া যায়।

শহরের পথে বেরোলে মনে হতে পারে

যেন কোনো পাশ্চাত্য দেশ। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সেই ভুল ভাঙে। নাগাভূমির মানুষ যত আধুনিক পোশাকই পরিধান করুন না কেন সবশেষে গায়ে তাদের একটা চাদর থাকবেই—পুরুষ মহিলা সবারই। সরকারি অফিসার, মন্ত্রী প্রায় কেউই এর ব্যতিক্রম নন। তবে সকাল আটটা থেকে দশটা-এগারোটা অবধি চারদিকে এত সমবেত প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয় যে পাশ্চাত্য শহর বলে মোককচংকে ভাবতে তখন আর কষ্ট হয় না। চারদিকে অসংখ্য স্কুল, বেশির ভাগ যদিও প্রাইভেট। বলা যায় স্কুলের শহর। স্কুলগুলি ইংরেজি মাধ্যমের, শোনা যায় অনেক স্কুল (প্রাইভেট) চলে বিদেশী টাকায়। মোককচং জেলা তথা শহরের প্রধান অধিবাসী আও নাগারা শতকরা একশো ভাগই খৃস্টান। তাই খৃস্টান ছেলেমেয়েদের সমবেত প্রার্থনা সঙ্গীতে সকালের মোককচং থাকে সদা মুখরিত। সকালের রোদের বিরল ঝিকিমিকি বা নেমে আসা মেঘের মিতালীর সঙ্গে মিলে সেই সঙ্গীত সৃষ্টি করে শ্রুতিসুখকর ও দৃষ্টি-নন্দন পরিবেশ।

অনেকটা এইদিক থেকেই মোককচংয়ের গুরুত্ব ও খ্যাতি। সমগ্র নাগাভূমিতে শিক্ষার আলোক প্রথম প্রতিফলিত হয় মোককচংয়ে অর্থাৎ আও-নাগাদের বাসভূমিতে। এখান থেকেই তা নাগাল্যান্ডের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। খৃস্টধর্ম প্রচারের সূচনা হয় এ অঞ্চলে—মোককচং জেলার ইমপুরে। ১৮৭২-এর ৯ নভেম্বর ন'জন আও-নাগা শিবসাগরে ধর্মান্তরিত (baptised) হন। ১৮ ডিসেমবর আমেরিকান ব্যাপটিসট মিশনের রেভাঃ ই ডব্লু ক্লার্ক আসামের শিব-সাগর জেলার ভিতর দিয়ে মোককচংয়ে প্রবেশ করেন এবং মোলাংইমচেন গ্রামে শিবির স্থাপন করেন। ওই প্রথম বিদেশী মিশ-নারীর প্রবেশ ঘটলো নাগাভূমিতে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৮৭৬-এ মোককচং ব্রিটিশ শাসনাধীন হয়। ১৮৯৪-এর ৪ অকটোবর বর্তমান মোককচং শহরের অনতিদূরবর্তী গ্রাম ইমপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় মিশন সেনটার। তারপর বহু বছর ধরে ইমপুর শুধু আও-নাগাদেরই নয়, সেমা লোথা চাং ফোম ও সাংতাম নাগাদের গীর্জাসমূহেরও প্রধান কেন্দ্র ছিল। নাগাভূমিতে খৃস্টধর্মের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ১৯৭২-এ ইমপুরে উৎসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে একটি সেনটিনারী হল প্রতিষ্ঠিত হয়।

খৃস্টধর্মের আগমন ও আধুনিক সভ্যতার প্রসারের পূর্ব পর্যন্ত নরহত্যা ছিল নাগাদের, এবং আও-নাগাদেরও দৈনন্দিন কর্ম। এটি তাদের কাছে গৌরবজনক কাজ বলে বিবেচিত হত। নাগাদের শিল্পকলা, কারুকর্ম, সঙ্গীত ও নৃত্য প্রভৃতিকে অনুপ্রাণিত করতো এই নরহত্যা। অধিকাংশ শিক্ষিত নাগা অস্বীকার করলেও এখনও কেউ কেউ আছেন যারা তাদের পিতামহদের নরমাংস ভক্ষণ করতে দেখেছেন, কালের ধর্মে পরবর্তীকালে যা ক্রমে অবলুপ্ত হয়েছে।

আওরা বৃহত্তর নাগা পার্বত্যজাতির অন্যতম গোষ্ঠী। সমতলবাসীর (বিশেষ করে ইউরোপীয় ও বাঙালীর) দীর্ঘকালের বিশ্বাস ছিল নাগা মানে 'নগ্ন'। কাছাড়ীদের পূর্বপুরুষের কাছে নাগাভূমির পার্বত্য অধিবাসী-দের পরিচিত ছিল যুদ্ধপ্রিয় জাতি। কাছাড়ীরা তাঁদের বলতেন নানগ্রা (NANGGRA), যার অর্থ যোদ্ধা। এই নানগ্রা-ই অসমীয়া উচ্চারণে বিকৃতি লাভ করে হয় নাগ্রা (NAGGRA), যা থেকে বর্তমান নাগা (NAGA) শব্দের আবির্ভাব। কাজেই নাগা মানেই নগ্ন এমন ভাববার কোন কারণ নেই। অবশ্য বাঙালীর কাছে 'নাগা' শব্দটি 'নগ্ন' শব্দের প্রায় প্রতিরূপ, 'নাগা সন্ন্যাসী' বলতে বাঙালী নগ্ন সন্ন্যাসীকেই নির্দেশ করে। তবে নাগারা এককালে যে নগ্ন ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই (প্রাচীন কোন জাতিই বা তা না ছিল?)। গারো পাহাড়ের গারো পার্বতাজাতির লোকেরা নাগাদের থেকেও বেশি নগ্ন ছিলেন, কিন্তু কই বাঙালী তো তাদের নগ্ন বা নাগা বলেননি। অবশ্য এখনো মাত্র একখণ্ড বস্ত্র পরিহিত নানা অলংকার ও অস্ত্রে সজ্জিত প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নাগাযোদ্ধাদের চোখে পড়ে।


নিত্যদিনের অভ্যাস/বয়নশিল্পে আও রমণী / দেবপদ চৌধুরী

মোককচং জেলার অধিবাসী আও-নাগারা, অন্যান্য নাগাজাতির মতই, মোঙ্গলীয় লক্ষণক্রান্ত। দেহবর্ণ হরিদ্রাভ, সামান্য চাপা নাসিকা; ঢেউ খেলানো চুল। এরা সুঠাম ও সুগঠিত স্বাস্থ্যের অধিকারী। অত্যন্ত পরিশ্রমী ও শক্তিশালী। ভারবহন ক্ষমতা বিস্ময়কর। এসবই হয়ত শীতল আবহাওয়া ও সহজ খাদ্যাভ্যাসের অনিবার্য ফল।

জেলার মোট গ্রামের সংখ্যা ছিয়াশি। একটি মাত্র শহর এবং তা মোককচং। সুদৃশ্য লীলায়িত চড়াই উৎরাই এবং বিভিন্ন পাহাড়ের গায়ে নির্মিত বিভিন্ন মাপের ঘরবাড়ি এই ছোট্ট শহরটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। দু'তিন রকমের পাইন গাছে শোভিত শহরের ডি সি হিলের বিভিন্ন অংশ থেকে দৃষ্ট সিভিল হসপিটাল ও টি বি ওয়ার্ড চমৎকার। একটি জেলাসদরের পক্ষে যা কিছু আবশ্যিক মোটামুটি সবই রয়েছে মোককচং-য়ে। অসংখ্য স্কুলের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মোককচং গভরনমেনট হাইস্কুল, ওংপাংকং গভঃ হাইস্কুল, এডিথ ডগলাস এবং নিবোকো হাইস্কুল। প্রথমোক্ত স্কুলটি অতি পুরাতন ও বিশিষ্ট। নাগাভূমির বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই স্কুলের ছাত্র, যাদের কারো কারো জন্যে আও-নাগারা শুধু নয়, অবশিষ্ট ভারতবাসীও গর্ববোধ করতে পারে। এ'দের একজন ডঃ টি আও—অবসরপ্রাপ্ত ডিরেকটর অব নাগা-ল্যানড হেলথ সার্ভিস; ভারতের অলিমপিক প্রথম ফুটবল দলের অধিনায়ক—মোহনবাগানের প্রাক্তন অধিনায়ক। অপরজন ডঃ সেন্কা আও, আমেরিকায় 'ম্যান অব সায়েনস' উপাধীতে ভূষিত, সেখানকার একটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অ্যাসোসিয়েটেড প্রোফেসর। এ দু'জন ছাড়া ডঃ ইমকংলিব্য আও, নাগাল্যানড আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর পূর্ণরাজ্যরূপে গঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে যিনি অস্থায়ী সরকারের

চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। এই দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিত্বটি বৈরী নাগাদের হাতে নিহত হন। মোককচং সিভিল হসপিটালটি তাঁরই স্মৃতি রক্ষার্থে হয়। Dr Imcong-liba Ao Memorial Hospital. পরবর্তীকালে একটি ফুটবল প্রতিযোগিতারও প্রবর্তন হয় তাঁর স্মরণে। মধ্যবর্তী অস্থায়ী সরকারের চীফ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর এবং নাগাল্যানডের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী পি শিলু আও-ও এই স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র।

খেলাধুলোর ক্ষেত্রেও, বিশেষ করে ফুটবলে, এ স্কুলের খ্যাতি রয়েছে। ১৯৬৮-তে এই স্কুল সুব্রত কাপে রানার্স আপ; পরে আরেকবার সেমিফাইন্যালিস্ট।

উচ্চতর শিক্ষার তেমন ব্যাপক ব্যবস্থা নেই এখানে। কলেজ মাত্র একটি, তাও তাতে শুধুই কলাবিভাগ—ফজল আলী গভঃ কলেজ। ম্যাট্রিক পাশ করার পরেই ছাত্রছাত্রীরা সমতলের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন, অধিকাংশ চাকুরি বা বিবিধ ব্যবসার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন, সংসারীও হয়ে পড়েন কেউ কেউ। গোটা জেলায় এই একটি বাদে আর একটি কলেজ রয়েছে—বাইবেল কলেজ, মিশনারীদের দ্বারা ইমপুরে প্রতিষ্ঠিত। সম্প্রতি এটি মোককচং শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরবর্তী, সুন্দর গ্রাম আউংলেনডেনে স্থানান্তরিত হয়েছে। কলেজটির বর্তমান নাম—ক্লারক মেমোরিয়াল কলেজ। ঘুরে ফিরে ক্লারক সাহেবের কথাই আসছে। আও-নাগারা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁকে চিরদিন স্মরণ করবেন। ব্যাপটিসট মিশন থেকে ১৯১১ সালে প্রকাশিত 'আও-ইংলিশ ডিকসনারির'-ও রচয়িতা এই স্মরণীয় ফাদার।

শহরের শিক্ষার হার উৎসাহব্যঞ্জক। শতকরা ৬২.১০ জনই শিক্ষিত। পুরুষ ৬৫.১৫ এবং নারী ৫৪.৭৭। প্রাণোচ্ছল আও ছেলেমেয়েরা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর প্রতি, সমতলের তুলনায়, যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত। তবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাম্প্রতিক 'বিদেশী-হটাও' আন্দোলনের ঢেউ মোককচংকেও নাড়া দিয়েছে। কিছুদিন আগে এডিথ ডগলাসের জনৈকা সমতলবাসিনী শিক্ষয়িত্রী ওই স্কুলেরই একটি ছাত্রের হাতে নিগৃহীতা হয়েছেন।

আও ছেলেমেয়েরা মেলামেশার দিক থেকে খুবই সহজ ও সাবলীল, bold-ও। শহরের সব স্কুলই কো-এডুকেশন। প্রেম-প্রণয়, বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ তাই এখানে জল-ভাত। জাতি ও বর্ণভেদ এবং বিষাক্ত কোন প্রথা এখানে স্বীকৃত নয়। বিভিন্ন উপ-গোষ্ঠীতে বিভক্ত আওদের এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অপর গোষ্ঠীর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে, কিন্তু একই গোষ্ঠীতে বিবাহ অত্যন্ত গর্হিত ও গুরুতর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবে শিক্ষিতা অনেক কুমারীর, স্কুল ছাত্রীরও, এক বা একাধিক সন্তানও রয়েছে। 'যৌবন রাগে রক্ত বনস্থলীতে রতিদ্বিতীয় মদনের' এখানে সদাই সমাগম। আও তরুণীদের অনেকেই মোহিনী ও আকর্ষণীয়া। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণা। সমতলবাসী অনেক পুরুষই তাতে মজেন; কেউ কেউ শেষাবধি নাগাভূমির ঘরজামাইও থেকে যান। সুধীরকুমার দাশগুপ্ত তাঁর 'অতুলনীয় আসাম' প্রবন্ধে লিখেছেন, "বাংলাদেশের মধ্যযুগের প্রসিদ্ধি—এই কামরূপে কামাখ্যা অঞ্চল 'কদলী' রাজ্য, এখানে আসিলে মায়াবিনী যাদুকরীদের প্রভাবে পুরুষ ভেড়া হইয়া যায়, আর কেহ স্বদেশে ফিরিয়া আসে না।" কথাটা নাগাভূমির ক্ষেত্রেও সত্য। তরুণ-তরুণীর এই সহজ মেলামেশার কথা স্মরণে রেখেই সম্ভবত ডি সি হিলের সম্মুখবর্তী পাহাড়ের শীর্ষে জন্ম নিয়েছে 'লাভারস পারক', বর্তমানে যেখানে ট্যুরিসট সেনটার চালু করবার আয়োজন চলছে।

ফুটবলের প্রতি মোককচংবাসীর আকর্ষণ দুর্বার। ছেলে, বুড়ো, তরুণী সবাই ছোটেন ফুটবল মাঠে। খেলার মাঠ হয়ে ওঠে রঙের মেলা—উচ্ছল আনন্দের সফেন সমুদ্র। মোককচং গভঃ হাইস্কুলের সংলগ্ন স্টেডিয়ামটিতে খেলা চলাকালীন কখনও কখনও একরাশ মেঘ এসে ঢেকে দেয় মাঠের এক অর্ধ। তখন মনে হয় এ যেন স্বর্গের কোন নন্দন কানন।

রঙের খেলা বস্ত্রবিপণীতেও। নাগাশাল, চাদর ও ব্যাগ খুবই সুন্দর; মণিপুরী হস্তশিল্প থেকেও উন্নত ও অধিকতর আদৃত। অন্যান্য হস্তশিল্পের মধ্যে আকর্ষণীয় হচ্ছে নেকটাই, বেডকভার, টেবল-ঢাকনি, পর্দা প্রভৃতি। প্রায় ঘরেই রয়েছে তাঁতযন্ত্র। আও মহিলারা যে উলের চাদর বোনেন তাতে যথার্থ আধুনিকতার স্পর্শ লাগলে তা জগদ্বিখ্যাত হতে পারে।

সবথেকে যা বেশি আকর্ষণীয় তা হচ্ছে এদের শ্রেণীহীন সহাবস্থান এবং status সম্বন্ধে অনুকরণযোগ্য নিরাসক্তি। সুসভ্য ও খৃস্টধর্মাবলম্বী হয়েও তারা প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত (প্রায় সকলেই খৃস্টান হলেও একদা তাদের নিজস্ব ধর্ম ছিল এবং তারা ছিলেন এক পরম শক্তির উপাসক, যে শক্তিকে তারা বলতেন 'লিজাবা') উচ্চ পর্যায়ের মন্ত্রী, অফিসার প্রভৃতি অনেকেরই গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে রয়েছে অচ্ছেদ্য যোগ। 'Dignity of Labour'-এর ফলে একজন মন্ত্রীকেও দেখা যায় মাঠে কোদাল চালাতে।

আও নাগারা স্বভাবত অতিথিবৎসল ও পরোপকারী। সঙ্গীত ও নৃত্যপ্রিয়। বীটলদের অনুকরণে অনেক 'Beat Group' রয়েছে। অনেকটা কলকাতার মতই সারা বছর ধরেই এরা নৃত্যগীতের আয়োজন করে থাকেন স্থানীয় টাউন হল এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। ২৬ জানুয়ারি এবং বিশেষ করে বড়দিনে এসবের তীব্রতা ও ব্যাপকতা চোখে পড়ার মত।

পোশাকে-আশাকে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের আধিক্য থাকলেও কোন কোন তরুণী বেশ স্বচ্ছন্দেই শাড়িও পরে থাকেন। তবে মহিলাদের পরিধানে, সাধারণভাবে, পাশ্চাত্ত্য ও নিজস্ব ঐতিহ্যের মিশ্র সমাবেশ লক্ষ্য করা যায় এবং বেশ ভাল লাগে।

এমন একটি জেলা তথা শহরে আও নাগাদের নিজস্ব সাহিত্যের নিয়মিত চর্চার



পাহাড়ে সমতলে মিতালি দেবপদ চৌধুরী

অভাব বেশ পীড়াদায়ক। অবশ্য সাহিত্য চর্চার পক্ষে পর্যাপ্ত উপযোগী হয়ে ওঠেনি আওদের মাতৃভাষা। তিব্বতবর্মী ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত এই আও ভাষা আবার একটি নয়—অনেক এবং সেগুলির একটির সঙ্গে আরেকটির ব্যবধান এত দুস্তর যে একে অপরের কথাই বুঝতে পারেন না। মুখ্য তিনটি ভাষা—চুলিং, মংসেন, চাংকি। চুংলি আও নাগাদের সরকারি ভাষা, যে ভাষায় শিক্ষা বিভাগের প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যবই রয়েছে। গোহাটি বিশ্ব-বিদ্যালয়, আসাম মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্ষদ এবং পরবর্তীকালে নাগাল্যানড মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্ষদ চুংলিভাষাকেই আও নাগাদের মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অজস্র ভাষা ও উপভাষা থাকার ফলে নাগাল্যানডে সাধারণভাবে সহজ যোগাযোগের যে ভাষা প্রচলিত তা হল 'Nagamese' আসলে এটি ভাঙা অসমীয়া (Broken Assamese)। অ-নাগাদের সঙ্গে নাগাদের এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর নাগাদের মধ্যে এটিই সর্বাধিক প্রচলিত মৌখিক ভাষা।

'মোককচং' ও 'আও' নাম দুটির উৎপত্তি

কিভাবে ? প্রচলিত লোককাহিনী অনুসারে আও-নাগারা তাদের আদি বাসভূমি চুংলিয়িমতিগ্রাম ( মোককচং শহরের দক্ষিণ পূর্বে কোণে অবস্থিত ) থেকে সোয়িমে এসে বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের দলনেতা বা সর্দারের ( উঙ্গার ) অস্বাভাবিক ও অকাল মৃত্যুতে তারা সেই বসতি পরিত্যাগ করে অন্য এক গ্রাম কোরিডং-য়ে চলে আসেন। সেখান থেকে বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে তারা নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েন কিছু চলে যান আবার পূর্বোল্লিখিত গ্রাম সোয়িমে এবং গ্রামের নতুন নামকরণ করেন উংমা ( শহরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ), যার অর্থ loss of finger. পরে আবার এর নাম পরিবর্তিত হয় তাদের নেতৃস্থানীয় এক বিশিষ্ট ব্যক্তির নামানুসারে—কুরাডি। একদিন শিকারে গিয়ে এই কুরাডি মনুষ্যবাসোপযোগী একটা নতুন জায়গার সন্ধান পান এবং ফিরে এসে দলের লোকজনদের সে-কথা বলেন। তারাও রাজী হয়ে যান। কিন্তু সোয়িমের অধিকাংশ অধিবাসী ও বয়োজ্যেষ্ঠরা এ-ব্যাপারে ঘোরতর অমত প্রকাশ করেন। তারা চাননি তাদের ভ্রাতৃস্থানীয়েরা অন্যত্র যান এবং নতুন গ্রামের পত্তন হোক। কিন্তু তাদের অনুরোধ ও বিবিধ যুক্তি উপেক্ষা করে কুরাডি ও তাঁর অনুগত জনেরা পিতৃভূমি সোয়িম বা উংমা পরিত্যাগ করে সেই নতুন জায়গায় চলে এলেন এবং তার নাম দিলেন মোককচং। পিতৃভূমির ইচ্ছা ও আগ্রহ অগ্রাহ্য করে চলে এসেছিলেন বলেই ওই নাম। মোকক (MOKOK) মানে অগ্রাহ্য বা অমান্য করা এবং চং (CHUNG) মানে পিতৃভূমি পরিত্যাগ করে অন্যত্র গমন।

'আও' শব্দটির উদ্ভব-বিষয়ক কাহিনীটিও এমনি আকর্ষক। পূর্বোল্লিখিত চুংলিয়িমতি গ্রামের লোকসংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়াতে কিছু লোক অন্য জায়গার সন্ধান করেন এবং পশ্চিম দিকে চললেন দিকু ( DIKHU ) নদী পার হয়ে। নদী পারাপারের জন্যে তারা একটা বেতের সাঁকো তৈরি করেছিলেন। দলের একটা বড় অংশ সেই সাঁকো পার হয়ে কিছুটা ভীত হয়ে পড়েন এই ভেবে যে নতুন জায়গাটাও সকলেরই বসবাসের পক্ষে যথেষ্ট হবে না। তাই তারা নির্মমভাবেই সেই সাঁকোটা কেটে দেন, ফলে পশ্চাদবর্তীরা আর এগোতে পারেন না। যারা দিখু অতিক্রম করতে পারলেন তাদেরই বলা হয় আওর ( AOR ) অথবা আও ( AO ) যার অর্থ গমন ; আর, যারা পশ্চাতে রয়ে গেলেন তাদের নাম মেরির ( MERIR ) অর্থাৎ পশ্চাতে পড়ে থাকা। আজকেও নাগাদের বোঝাতে এই 'মেরির' শব্দ ব্যবহার করে থাকেন।

ঐতিহাসিক আর্ণল্ড টয়েনবি তাঁর 'Mankind and Mother Earth' গ্রন্থে লিখেছেন, 'Any account of anything is bound to be selective. The human intellect has not the capacity for comprehending the sum of things in a single panoramic view.' বর্তমান রচনাতেও তা সম্ভব নয়। নাগাভূমির স্বর্গ মোককচং শহরটিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়েও এ-সত্যকে মেনে নিতে হয়। তবু যা মনকে নাড়া দেয় তা প্রকাশ না করেও পারা যায় না। উচ্ছল আনন্দ ও ভালোর যে উষ্ণ স্পর্শ হৃদয় নাচায় তারই পাশাপাশি রয়েছে কিছু গভীর কালো দিক। হাসপাতালে অযত্ন ও হৃদয়হীনতার আধিক্য (আধুনিক সভ্যতার অনুসরণে ?) ডঃ ইমকংলিবা আওর পবিত্র স্মৃতিকেই মলিন করছে। রাত্রে সরকারী বা প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার কোন ডাক্তারকে ডাকতে গেলে শুনতে হয়, 'মন্ত্রী মাতিলেও না যাব।' শহর উন্নয়নের জন্যে কেন্দ্র প্রচুর অর্থ ঢালছেন যা অন্যত্র বিশেষ করে সমতলে সুদুর্লভ। কিন্তু সেই বিপুল পরিমাণ অর্থ যে কোথায় যায় কেউ জানে না। বিদেশী অর্থেরও নিয়মিত সরবরাহ রয়েছে এখানে। অনেকের হাতেই রয়েছে কাঁচা টাকা।

খৃস্ট শৃঙ্খলার নিয়মিত শিক্ষার্থী হয়েও ব্যক্তিগত জীবনচর্যায় বৈপরীত্যই এখানে প্রকট। সাধারণভাবে প্রায় সংসারেই গৃহসজ্জা, যত্ন ও পারিপাট্যের অভাব। রাস্তাঘাট প্রত্যাশিত নয়। এখানে সেখানে তাম্বুল লাঞ্ছনা। পানের রস ও চূর্ণ চর্চিত. বাস স্টেশন, সিনেমা হল—কসমস ও ইসটারন—বর্ণনার অতীত। পান-আসক্তি ও পানাসক্তি এদের balance প্রায়ই বিপ্লব ঘটায়। সন্ধ্যে সাতটার পরই শহরে মধ্যরাত্রি নেমে আসে দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায় 'মধুর' (স্থানীয় সুরা) উৎপাতে। মধুরসসিক্ত এক শ্রেণীর যুবকের দ্বারা সমতলবাসী প্রায়ই রাত্রিতে লাঞ্ছিত হন। এসব অপরাধের কোন দণ্ড নেই। অপরিচয়ের অবগুণ্ঠন এসব কারণেও যে সরে না।



আও বৃদ্ধা

যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটেও উন্নত নয় (উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এ এক অভিশাপ)। মোককচং থেকে সপ্তাহে একদিন—রবিবার—বাস সারভিস পুরোপুরি বন্ধ। খৃস্টধর্মের গোঁড়ামি যোগাযোগকেও গ্রাস করেছে। বাকি ছদিন দূরপাল্লার বাস সারভিস মোককচং-আমগুড়ি (আসাম), মোককচং— মরিয়ানী (আসাম) দুটো করে ; মোককচং-ডিমাপুর, কোহিমা, মোককচং-তুয়েনসাং প্রভৃতি একটি করে। বৃষ্টি ও ধ্বসের ফলে রাস্তাঘাট প্রায়ই খারাপ থাকে—রাজ্য সরকারের বাসও যখন তখন খারাপ হয়। মধ্যপথে অঙ্গত্যা হরিভরসা। এই ভাবেই -দুর্গম, দুরতিক্রম্য ও বিঘ্নসংকুল মোককচংয়ের পথ। স্বর্গে যাওয়ার মতই কঠিন এবং ব্যয়সাধ্য। বলে অবশ্য লাভ নেই, রাজ্য সরকার বিষয়টা ভেবে দেখতে পারেন, প্রতিবেশী আসাম ও মণিপুর তাদের কৃপণ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করতেও পারেন।

জলের সমস্যা মারাত্মক। টিম টিম করছে ওয়াটার সাপ্লাই। শীতকালে জলের কষ্ট, সমতলবাসীকে বিশেষ করে, কাঁদিয়ে ছাড়ে। শহরে অটোরিকসা বা ট্যাকসির অভাব খুবই অনুভূত হয়। নাগাভূমির প্রায় শহরেই এ-ব্যবস্থা। অথচ মেঘালয়ের একটি সাধারণ ছোট্ট শহর জোয়াইতেও রয়েছে ট্যাকসি, আমেরিকান কায়দায় ক্যাব।

আসলে বৃহত্তর ভারতবাসীর আগ্রহ নেই জানবার, স্থানীয় অধিবাসীর ইচ্ছে নেই জানবার। এই দু' ধরনের নঙর্থ মনোভাব নিয়ে গড়ে উঠেছে প্রাচীর—অবিশ্বাসের, অপরিচয়ের। যদিও ব্যবসা ও চাকুরির খাতিরে এখানে প্রচুর বাঙালী, অসমীয়া, কেরলী ও অন্যান্য ভারতীয় রয়েছেন, তবু সেই সেতু—সদর্থ প্রগতি ও মিলনের—কই ? সদাহাস্যপাহাড়ী প্রকৃতিতো যৌবনের উদ্দীপনা নিয়ে মোহিনী মোককচং এবং এ রকম অন্যান্য সুন্দরীরা—সেই প্রাচীর ভেঙে—সহস্র দৃষ্টির সিদ্ধপাতে সম্পূর্ণ অবারিত হবে কবে ? □

গতবছর ৩১ অকটোবর একদল ভূমিহীন কৃষক প্রায় ছাব্বিশ মাইল পথ হেঁটে এসে সমবেত হয়েছিলেন পটুয়াখালি জেলা কলেকটর ভবনের সামনে। তাদের দাবি ছিল পাঁচটি। মিছিলে সামিল হয়েছিলেন বহু বৃদ্ধ এবং মহিলাও। জেলা কলেকটরকে যে স্মারকলিপি তারা দেন তাতে দাবি ছিল--চর এলাকা থেকে কিছু জোতদার, ভুয়া-ভূমিহীন ও ভুয়া সমবায়ীদের হটিয়ে আসল ভূমিহীন ও গরিব চাষীদের সেখানে বসাতে হবে। জমি বিলি করার সময় স্থানীয় জন সমাবেশে প্রকৃত ভূমিহীনদের সনাক্ত করতে হবে। এই এলাকায় যেসব যাযাবর মৎস্যজীবী রয়েছেন তাদের জন্য ঘর-বাড়ি বাঁধবার জমি দিতে হবে। জমি দেবার পর সনদ বন্দোবস্তের রসিদ দিতে হবে এবং জমি ফিরে পাবার আন্দোলন করতে গিয়ে যেসব গরিব কৃষক বাংলাদেশ।' সন্ধ্যায় কুয়াশা ভেদ করে সিলিউট ছবির মত ঘোরাফেরা করছে কিছু মূর্তি। হাতে হাতে কোদাল আর ঝুড়ি। মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে একদল, ঝুড়ি ভরছে একদল আর মাটি কেটেই চলেছে একদল।

দেশকে খাদ্যে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য প্রেসিডেনট জিয়াউর রহমান প্রায় এক বছর আগে খালখনন কর্মসূচী হাতে নেন। এই কর্মসূচীকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে পারলে চাল ও গমের উৎপাদন বাড়বে এবং বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী ক্রমশ বন্ধ করা যাবে এই ছিল আন্দোলনের উদ্দেশ্য। জিয়াউর রহমানের ভাষায়, মূলত এ হবে শান্তিপূর্ণ কৃষি বিপ্লব।

খালকাটার দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫৮১টি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ১ নভেম্বর রকম মিথ্যা কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে। খালকাটার প্রথম পর্যায় তাঁর মতে পুরোপুরি সার্থক এবং দেশে এর জন্য খাদ্যোৎপাদনও বেড়েছে। বিরোধীদের মতে ঢাক ঢোল পিটিয়ে, প্রচার প্রোপাগানডা করে সরকারের যে পরিমাণ টাকা খরচ হচ্ছে সত্যি সত্যি একটা খাল কাটতে তার চেয়ে কম টাকা খরচ হত।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুযায়ী এই অভিযানে সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েছিলেন বা এবারেও দেবেন। কিন্তু এই স্বেচ্ছাশ্রম ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে অন্যদিক থেকে। প্রতিদিন সরকারি আমলা এবং ছোট বড় বিশেষজ্ঞ পেটরোল পুড়িয়ে গ্রামগুলিতে যাচ্ছেন খাল খনন কর্মসূচী পরিদর্শন করার জন্য। এতে প্রচুর জন সমাবেশ হয়। আর সেই সময় সরকারি টাকার অপচয়ও হচ্ছে কম নয়। কারণ এদের যাতায়াতের জন্য নিয়মিতভাবে

# গ্রামীণ বড়লোকদের জন্যেই কি খালকাটা বিপ্লব ? ●●● যীশু চৌধুরী

গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং সরকারি অফিসারদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছেন তাদের মুক্তি দিতে হবে. মামলা-মোকদ্দমা প্রত্যাহার করতে হবে।

পরদিন বাংলাদেশের আর একপ্রান্তে চলেছিল আর এক অভূতপূর্ব মিছিল। স্থান দিনাজপুর। আসছেন রাষ্ট্রপতি স্বয়ং। তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য জন সমাবেশ শুরু হয়ে গেছে। দলে দলে লোক আসছেন। শিশু থেকে বৃদ্ধ, যুব, নারী কেউ বাদ নেই। কোন দাবি নিয়ে আসছেন না তারা এমনকি জিয়াউর রহমানের বক্তৃতা শোনার ইচ্ছাও তাদের খুব তীব্র নয়। কেবল একটু চোখের দেখা। দেশের রাষ্ট্রপতিকে কে না নিজের চোখে দেখতে চায় ?

রাষ্ট্রপতি এলেন সারা দেশব্যাপী খাল খনন বিপ্লব উদ্বোধন করতে। এটা অবশ্য বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়। দিনাজপুর থেকে ছাব্বিশ মাইল পূর্বদিকে চিরিরবন্দর খাল খোঁড়ার উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি নিজেই।

অতঃপর জিয়াউর রহমান তিন মাইল লম্বা এই খাল খোঁড়ার ভার ছেড়ে দেন স্থানীয় জনগণের ওপর। তারপর তিনি চলে যান লালমণির হাট, বগুড়া ও টাঙ্গাইল। চিরির-বন্দর খালটি লম্বায় তিন মাইল, চওড়ায় ৪০ ফুট। প্রায় ৪শো ৪৪ জন লোক এই খাল কাটায় অংশ নিয়েছেন। তার মধ্যে আছেন মাইতারা গ্রামের সত্তর বৎসর বয়স্ক চাষী আবেদিন মিয়া, হাসিমপুরের ৫৮ বৎসর বয়স্ক মোহম্মদ আজিম, স্থানীয় পাইলট হাই ইসকুলের গরিব শিশুরাও। এদের সকলের গলায় গান, 'প্রথম বাংলাদেশ, আমার শেষ দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্বোধন দিনেই ৫০টি প্রকল্প চালু হয়ে গেছে। তার মধ্যে চারটি দিনাজপুরে বাকি ছেচল্লিশটি দেশের অন্যান্য অংশে। নতুন পর্যায়ে প্রায় এক কোটি স্বেচ্ছাকর্মী যোগ দেবেন। এদের শ্রমবাবদ সরকার খরচ করবে ৫ লক্ষ মণ গম। খালকাটার শতকরা ১৫ ভাগ ব্যয় হবে সরকারের। কোদাল এবং ঝুড়ি কেনার প্রথম দেড় কোটি টাকা কেন্দ্র সরকার ইতিমধ্যে স্ব-নির্ভর গ্রাম সরকারগুলিকে দিয়ে দিয়েছেন। এরাই আন্দোলনের স্থানীয় প্রযোজক।

এবারের আন্দোলনে শুকনো মরসুমেও ১২ লাখ থেকে ১৫ লাখ একর জমিতে সেচের নেটওয়ারক গড়ে তোলা যাবে বলে অনেকের আশা। এখন দেশের মাত্র শতকরা ১০ ভাগ জমিতে শুখা মরসুমে জল পাওয়া যায়। ফলে মাত্র ২ কোটি ২৫ লাখ একর জমি পড়ে আছে প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। বর্ষার সময়েই এখানে ফসল হতে পারে। প্রথম পর্যায়ের যে আন্দোলন ১৯৭৯ সালে শুরু হয়েছিল তাতে ১৯৩টি খাল কাটা হয়েছে, আগেকার কাটা খাল সংস্কার করা হয়েছে।

বাংলাদেশে একটা কথা চালু আছে ঃ নষ্ট করেছি গাজী গান গেয়ে/বারো আনা উপায় করেছি/তিন টাকা খেয়ে।

খালকাটা বিপ্লবকে বাংলাদেশের অনেক সচেতন মানুষই সেইভাবে দেখেন। যদিও জিয়াউর রহমান খালকাটার বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের উষ্মানি সম্বন্ধে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন দিনাজপুরের জনসভায়। তাঁর মতে, বিরোধীরা সরকারের বিরুদ্ধে নানা লাগছে গাড়ি, ট্রাক এবং মোটর লঞ্চ। তাদের পরিদর্শনের সময় শহুরে বাবু দেখার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ফলে সেদিনের মত কাজ বন্ধ থাকে।

পটুয়াখালির যে ভূমিহীন কৃষকদের দীর্ঘ পদযাত্রার কথা বলা হয়েছে এবার সে প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। বাংলাদেশের বিশিষ্ট খবরের কাগজ 'দৈনিক ইত্তেফাক' বলেছে, এখনও পর্যন্ত যত খাল কাটা হয়েছে তার বেশিটাই হয়েছে গরিব এবং স্বল্প জমির মালিকদের জমির ওপর দিয়ে।

যারা খালকাটার কাজে স্বেচ্ছাশ্রম দিচ্ছেন তাদের ভাগে জুটছে গম এবং কিছু খুচরো পয়সা। কিন্তু খালকাটার যাবতীয় সুফল পাচ্ছেন ঐ গ্রামীণ বিত্তশালী মহল। এই গ্রামীণ বড় লোকরাই গত বছর বাংলাদেশ সরকারকে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার আয়কর ফাঁকি দিয়েছেন বলে খবরে জানা গেছে।

সে কারণে মনে হয়, খাল কাটা কর্মসূচী যদি স্বার্থক হয় তবে ভূমিহীনের সংখ্যা আরও বাড়বে। সেচের সুবিধা পেয়ে গ্রামীণ বড় লোকেরা ফুলে ফেঁপে উঠবে।

অন্যদিকে যে ভাবে খাল কাটা হচ্ছে, বাংলাদেশের সেচ বিশেষজ্ঞদের মতে তা অবৈজ্ঞানিক। এসব খালের গভীরতা কম হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিণাম খুব যে শুভ হবে না সে মত অনেকেরই। তাদের মতে, দেখা দেবে হয়তো বা আরও ভয়াবহ বন্যা। এবং ভূমি-হীন চাষীর মিছিল হবে আরও দীর্ঘ এবং তা রাজধানী ঢাকার দিকেই যাবে। ☐

# ওপার বাংলা

## সেই বিমান দস্যু

ঢাকা-কলকাতা বিমান ছিনতাই করে '৭১-র জুলাইয়ে সংবাদ শিরোনাম হয়েছিল সৈয়দ নজরুল ইসলাম। সম্প্রতি যশোর দায়রা আদালতে তার অপরাধের সাজা হয়েছে। যশোর দায়রা আদালতের জজ জনাব মুজিবুর রহমান খান তাঁর রায়ে নজরুল ইসলামকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা জরিমানা করেছেন।

( দৈনিক বাংলা )

## জেনেশুনে বিষ

কিশোরগঞ্জের আঠারো বছরের তরুণ অজিত ভালবাসতো ষোড়শী প্রতিবেশিনী অপর্ণাকে। বাড়িতে আপত্তি। অজিতের মা একদিন অপর্ণাদের বাড়িতে এসে অপর্ণার মাকে খুব একচোট নিলেন। পাশের ঘরে অপর্ণা সব শুনলো। তারপর পান করলো কীটনাশক বিষ।

অজিত গিয়েছিল আত্মীয়ের বাড়ি। পরদিন এসে সব শুনলো। তারপর সেও অপর্ণার মতো···। সব শেষ।

★

ফারাবাড়ির আবদুল লতিফ ভালবাসতো বানুকে। বাড়ির আপত্তি। একদিন উধাও হল দু'জনেই। খোঁজা হল খুব, পাওয়া গেলো না কাউকেও।

কাছেই আখের ক্ষেত। একদিন একজন দেখলো আখের ক্ষেতে গলিত এক মৃতদেহ। এল পুলিশ। গলিত পুরুষ দেহের পাশেই পাওয়া গেল একটি নারীকংকাল। পরীক্ষা করে জানা গেল, ওরাই—হ্যাঁ লতিফ আর বানু।

পুলিশ বলেছে, এটাও আত্মহত্যা। কিন্তু লতিফ আর বানুর আত্মীয়রা একথা মানতে রাজি নয়। লতিফের কাছে ছিল ত্রিশ হাজার টাকা। টাকার লোভেই কেউ হয়তো হত্যা করেছে ওদের।

( দৈনিক ইত্তেফাক )

## খুচরো ঝামেলা

কুড়িগ্রাম মহকুমায় খুচরো পয়সা পাওয়া হচ্ছে না। লোকের পকেটে খুচরো নেই। দোকানে নেই। এমনকি ব্যাংকও খুচরো পয়সা সরবরাহ করতে পারছে না। রোজই দোকানদার খরিদ্দারে ঝামেলা ঝগড়া হচ্ছে

এর মূলে রয়েছে অসাধু কিছু লোক। তারাই খুচরো পয়সা চেপে দিয়ে কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি করেছে। ( দৈনিক ইত্তেফাক )

## আসছেন, তিনি আসছেন

সামুদ্রিক মাছ জনপ্রিয় করার জন্যে বিদেশ থেকে বাবুরচি আসছেন। তিনি সমুদ্রের মাছ থেকে চপ, কাটলেট, ফ্রাই-এর মত মুখরোচক খাবার তৈরির প্রশিক্ষণ দেবেন ঢাকার রেস্তরাঁর বাবুরচিদের। —এ উদ্যোগ ঢাকার মৎস্য উন্নয়ন সংস্থার।

( দৈনিক ইত্তেফাক )

## মক্কায় বাংলাদেশী

তীর্থভূমি মক্কার পৌরসভার জন্যে জাতীয় জনশক্তি মন্ত্রণালয় ১৩২৭জন ক্লিনার ও ৩০জন ড্রাইভার রফতানি করেছেন। সরাসরি বিদেশী সংস্থার মাধ্যমে নিয়োগপত্র এসেছে আরও ৩১৪জন ক্লিনার ও ১৪জন ড্রাইভারের—এ তথ্য জানিয়েছেন জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী।

( দৈনিক ইত্তেফাক )

## গোস্তের দর

ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বাজার ও বিক্রয় কেন্দ্রে গোসতের দর বেঁধে দিয়েছেন। গরুর মাংস প্রতি সের ২৪ টাকা ধার্য হয়েছে। নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে মাংস বিক্রি করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। ( দৈনিক বাংলা )

## এম পি উবাচ

'মহিলারা তিন ইঞ্চি কাপড়ের ব্লাউজ পরিয়া রাস্তায় চলাফেরা করেন। তাহাদের মাথায় আলকাতরা মাখাইয়া দেওয়া উচিত।'



বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে 'ইসলামিক শিক্ষা ও গবেষণা ইনসটিটিউট' বিলের উপর আলোচনা প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদ সদস্য আলমাস হোসেন।

( দৈনিক ইত্তেফাক )

## সেবার মূল্য

পঁচিশ বছর বয়সের পরিচারিকা হাসিনা গণধর্ষণের ফলে মারা গেছে। নারিন্দার এক মেসে সে কাজ করত। অসুস্থ অবস্থায় সে হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং সেখানে মারা যায়। এরপর তাকে কবরও দেওয়া হয়। কিন্তু এক অভিযোগের ভিত্তিতে সুত্রাপুর থানার পুলিশ কবর থেকে তার লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্যে পাঠিয়ে দেয়। পুলিশ ঐ মেসবাড়ির বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার পরই সবাই মেস ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। (দৈনিক বাংলা)

## প্রতিশোধ

'জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালে যে ঘোষণা করেছিলেন তা বাস্তবায়ন করেই বঙ্গবন্ধুর হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে।' কুলিয়ারচক থানা আওয়ামী লিগের অধিবেশন বলেছেন লিগের সম্পাদক জনাব সৈয়দ আহমদ। ( সংবাদ )

## অমানবিক

শ্বশুরের সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার ধান্ধায় ছিল কুলপদ্দি গ্রামের কামেলা বিবির স্বামী। কিন্তু তার এই অপকর্মে বাদ সাধলো কামেলা বিবি! বাপের সম্পত্তি বে-আইনীভাবে দখলের চক্রান্তে সায় দিতে রাজি হল না সে। ব্যস, এই নারাজ হওয়াই তার কাল হল— কামেলার কোমল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে খেজুর কাঁটা বিঁধিয়ে দিয়েছে তার স্বামী। কামেলা এখন হাসপাতালে। ( দৈনিক ইত্তেফাক )

## তরমুজের গুড়

পাবনা জেলার চলন বিলের কহিত গ্রামের এক গৃহবধূ তরমুজ থেকে সুস্বাদু গুড় তৈরি করেছেন। তরমুজ থেকে যে গুড় তৈরি করা যেতে পারে, এটা আগে জানা ছিল না। কহিত গ্রামের বউটিও জানতেন না। রান্নাঘরে নতুন রান্নার পরীক্ষামূলক প্রয়াসে তৈরি হয়েছে তরমুজ-গুড়। প্রক্রিয়াটি কিন্তু খুবই সহজঃ কয়েকটি পাকা তরমুজ নিতে হবে। তারপর আলাদা করে নিতে হবে তরমুজের লাল অংশ। এবার ঐ লাল অংশ নিংড়ে বার করতে হবে তরমুজের রস। খেজুর অথবা তালের রসের মত এবার তরমুজের রস জ্বাল দিন। ব্যস, দিব্যি ফাসটো কেলাস গুড়!

যারা চেখেছেন তারা বলছেন, কোথায় লাগে তাল বা আখের গুড়!

( দৈনিক ইত্তেফাক )

# বিশ্ববিচিত্রা

## বাঘের পিসি

কৃত্রিম উপায়ে জাত পৃথিবীর প্রথম পিউমা-শাবকটি এখন লনডনের পশুশালায়। পিউমা বন-বিড়াল ঘরানার মার্কিনী সংস্করণ। পশু-চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানীদের ৩ বছরের চেষ্টায় এটি সম্ভব হল। দ্রুত অস্তিত্ব মুছে যাচ্ছে—এমন পশুদের এই কৃত্রিম প্রজনন-প্রক্রিয়ায় বাঁচিয়ে রাখা যাবে এবার থেকে। অচৈতন্য পুরুষ-পিউমাটির শুক্রানু ইনজেকসনের পঁচানব্বই



দিন পরে স্ত্রী পিউমা বাচ্চা প্রসব করে ওজন ছিল ১ পাউণ্ড। কৃত্রিম গর্ভাধানের আগে অবশ্য তাকে ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু ধারণের উপযোগী করতে দুটি ইনজেকসন করা হয়েছিল। শাবকটির জন্ম হয়েছে গত ৬ জুন ১৯৮০। প্রকল্পটির জন্য ব্যয় হয়েছে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার মত। পশুপালার বিজ্ঞান বিভাগীয় প্রধান ডঃ জন হারন বলেছেন, এই পদ্ধতিতে ১ বছরের মধ্যে ক্রম-ক্ষীয়মান পাণ্ডাদের জন্ম দেওয়া যাবে। পাণ্ডা হচ্ছে তিব্বতের স্তন্যপায়ী ভাল্লুক জাতীয় জীব।

## নে বাঁদর, খা

লনডন হাইকোরটের জুরীর রায়ে ড্যালির প্রায় ৬০ হাজার টাকা খেসারত মিলল। চোর সন্দেহে হোটেলের এই ওয়েসট ইনডিয়ান প্রধান পাচকটিকে গ্রেফতার করে নগ্ন অবস্থায় বিনা বিচারেই ৪৪ ঘণ্টা পুলিশ হেপাজতে আটক রাখা হয়েছিল। ৫ ফুট ৩ ইঞ্চির ড্যালিকে হাতকড়া পরাতে ও পুলিশ ভ্যানে তুলতে ৫ জন পুলিশের ৪ জনকে রীতিমত ঘায়েল হতে হয়েছে। ৪ দিনের শুনানির মধ্যে ওর ওপর বেশ ক'বার অত্যাচারও করা হয়েছে। এর মধ্যে, ওকে একজন পুলিশ শুধু একমুঠো মটর দানা ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল, 'নে বাঁদর, খা।'

## ইঁয়াদো কি বরাত

১৯ বছর পরে ৩ সহজাত ভাই পরস্পরকে চিনতে পারল। এই ত্রয়ীর প্রথম দু'জন প্রথমে ভেবেছিল যমজ। কাগজে ছাপা তাদের ছবি দেখে তৃতীয় ভাইটির পালিকা মা বুঝতে পারলেন, তাদের দত্তক-পুত্রটিও ঐ ত্রয়ীর একজন। তিনজনের কথা, হাসি, এমন কি সিগারেট ধরার ভঙ্গিটাও একেবারে একরকম। শ্রীমতী ক্লেয়ার কেলম্যানের এই দত্তক-পুত্রের নাম ডেভিড কেলমান। অন্য যমজ দু'জন রবারট সাফরান ও এ ডি গারল্যানড। নিউইয়রকের এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের পুনর্মিলন উৎসবে এরা হঠাৎ পরস্পরের পরিচয় পায়। এদেরই ছবি ছাপা হল কাগজে। তা দেখেই শ্রীমতী কেলম্যান নিঃসন্দেহ হলেন; ডেভিড ও এই ত্রয়ীরই একজন। তিনি তখনই ঐ দুই পুত্রের পালক পিতামাতা জোড়া দু'টির সঙ্গে দেখা করে একসঙ্গে লাউসি দত্তক সেবা-সংস্থায় গেলেন। তবে পরিচালক জানালেন তাদের ধারণা সত্যিই। তার এই শিশুরা কিন্তু ত্রয়ী নয়, আর একজন ভাই ছিল তাদের, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মারা গিয়েছিল সে।

## মৃত্যু-ঘণ্টা

বৃটেনের 'র‍্যাঙ্ক' চলচ্চিত্র-সংস্থা পাততাড়ি গুটোচ্ছে। অবশ্য এদের ৮টি তথ্যচিত্র সমাপ্তির পথে। এর ফলে সাড়ে চারশো কোটি টাকা বাঁচবে। এদের মহরৎ হত একটা বিরাট ঘণ্টা বাজিয়ে। খাজনার থেকে এদের বাজনা বেশি হত। তাই ছবিগুলো জনপ্রিয় হলেও মোটেই লাভজনক হয়নি। এদের সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত দু'টি সফল ছবি 'দি লোডি ভ্যানিশেস' ও 'সিলভার ড্রীম রেসার'। ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৩ এর মধ্যে এদের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির কয়েকটি হচ্ছে 'ব্রীফ এনকাউনটার' 'গ্রেট এক্সপেকটেশন' ও 'হ্যামলেট'। শিল্পপতি জোসেফ র‍্যাঙ্কের নেতৃত্বে ১৯৩০-এ সংস্থাটির জন্ম।

## সোনার হরিণ

নিউ ইয়রকের রিকারডো হোলডার (২৭) এবং তার এক সাঙাৎকে পাকড়াও করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা শহরের মিডটাউন ব্রংকস এলাকায় জনৈক পথচারিণীর গলা থেকে একটা সোনার হার ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করেছে। সোনার দাম বেড়ে যাওয়ায় এ ঘটনা নিউ ইয়রকে ঘটছে হাল হামেশা। পথেঘাটে ও টিউব রেলের স্টেশনে। কিছুদিন আগে দুই তরুণীকে সোনার চেয়েও দামী প্রাণ দিতে হয়েছে এ জন্যে। পুলিশী খবর : হার-ছিনতাইয়ের ঘটনা ধরা পড়ছে মাসে ৫০০টি। কিন্তু ঘটছে নিশ্চয়ই আরো অনেক বেশি।

## সর্বনাশা টেপ-রেকরড

ক-বাবু আগে ছিলেন পুলিশ, এখন অধ্যাপক। এক সময় সমারসেটের পৌর-শিক্ষা সংস্থার শ্রীমতী জিন ইলেটকে ১৫০ খানি রগরগে প্রেম-পত্র লিখেছিলেন। শ্রীমতী সেগুলি তাকে ফেরত দেবার বিনিময়ে দাবি



করছিলেন নগদ প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। চলন্ত একটি মোটরগাড়িতে এসব নিয়ে তাদের ৩৫ মিনিটের নরম-গরম বাতচিত লুকোনো পুলিশী ব্যবস্থায় টেপ-রেকরডারে ধরে রাখা হচ্ছিল। আর 'ক' বাবুর ঠিক সেই উত্তেজিত অবস্থায় হল হারট অ্যাটাক। স্টিয়ারিং-এর ওপর তখন চিরকালের মত সংজ্ঞা হারালেন তিনি। তার শেষ জবানবন্দী বৃটিশ কোরটের জুরীদের বাজিয়ে শোনানো হল ঐ সর্বনাশা টেপ-রেকরড থেকে।

শ্রীমতী জিনের বিরুদ্ধে ব্ল্যাক-মেলের অভিযোগ আনা হয়েছে। বিচার চলছে।

সংকলন : নিজন দেচৌধুরী
ছবি এঁকেছেন : জি সান্তা

# বেশির ভাগ বাঙালী দর্শকের পছন্দ প্রেমের ছবি

চন্দন চৌধুরী,
দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়



বাংলা ছবি মানেই তো লুচিভাজা, রান্নাকরা, বাসনমাজা আর কান্নাকাটি। এসব আমার ভাল লাগে না। অঞ্জন মুখার্জি (২৩)। সুপারভাইজর।

আমি চাই যতক্ষণ সিনেমা হলে থাকব ততক্ষণ অন্য জগতে থাকব। ঘরে দারিদ্র, বাইরে দারিদ্র, পয়সা দিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েও যদি একই দারিদ্র দেখতে হয় তবে আমি বাংলা ছবি দেখব কেন? সুকুমার দাস (২৯)। কারখানার কর্মী।

বাংলা ছবি মানেই তো বোকা চাকর, ন্যাকা সখী, এবং সেই সঙ্গে বিপত্নীক বাবা সমন্বিত একটি জগাখিচুড়ি গল্প, যা শুধু বিরক্তিই উৎপাদন করে। দেবাশীষ দত্ত (২৯)। অফিসার।

সিনেমায় জ্ঞান চাই না। সিনেমা দেখতে যাই চাঙ্গা হওয়ার জন্যে। কিন্তু চাঙ্গা হওয়ার বদলে যদি আরও মরে যাই তবে বাংলা ছবি দেখব কেন! উত্তম দাস (২৪)। স্টেনো।

মান্ধাতা আমলের গল্প আর চলে না। আজে-বাজে গল্প নিয়ে ছবি বন্ধ করা উচিত। বস্তাপচা সেনটিমেনট নয়, নতুনত্ব চাই। শুধু প্রবলেম তুলে ধরলেই হবে না, সলভ করার পথও দেখাতে হবে। সাথী বণিক (২৮)। শিক্ষিকা।

না, শুধু এ'রা ক'জনই নন; বাংলা ছবির প্রতি বিরূপ আরো অনেকেই। আর সে জন্যেই পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী-অস্থায়ী প্রায় সাতশ' সিনেমা হলের পাঁচশ'টিতেই নিয়মিত চলে হিন্দি ছবি।

প্রধানত সেকস ভায়োলেনসের জন্যই বাংলার দর্শকেরা হিন্দি ছবির দিকে ঝুঁকছেন—একথা কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাহলে সেকস ভায়োলেনসহীন ছবি রজনীগন্ধা, ছোটাসী বাত, গোলমাল, চিতচোর, কিনারা হিট করত না। মারপিটসর্বস্ব অনেক ছবি যে পশ্চিমবাংলায় ব্যবসা করতে পারেনি—তেমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। উদাহরণ কুন্দন, ভোলেভালা, পত্থর ঔর প্যায়েল।

দর্শকেরা কেন বাংলা ছবি দেখতে উৎসাহিত হন না তার কারণ জানবার জন্য সম্প্রতি একটা সমীক্ষা চালান হয়েছিল। দর্শকদের তালিকায় ছিলেন ডাক্তার, ইনজিনীয়ার, কেরানী, অফিসার, কারখানার মজদুর, স্কুল পালানো ছাত্র, কলেজের ছাত্রছাত্রী, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, বেকার, গৃহবধূ প্রভৃতি।

যারা নিয়মিত বাংলা ছবি দেখেন তাদের ৭১ শতাংশ বলেছেন—বাংলা ছবি তারা দেখেন আনন্দ পাওয়ার জন্য এবং বুঝতে সুবিধা হয় বলে। বাংলা ছবি দেখার অন্যান্য কারণ: (১) বাংলা ছবির বক্তব্য ভালো, (২) হিন্দি সিনেমার মতো তা সস্তা নয়, (৩) বাংলা ছবিতে উচ্চমানের অভিনয় দেখা যায় এবং (৪) বাংলায় অনেক সত্যিকারের উপভোগ্য ও ভালো ছবি হয়েছে।

বহু দর্শকের বক্তব্য—বাংলা ছবি দেখতে পরিবারের সকলকে নিয়ে যাওয়া যায় যেটা অধিকাংশ হিন্দি ছবিতেই সম্ভব নয়। তবে অনেকের অভিযোগ: বাংলা সিনেমার গতিপ্রকৃতি যেভাবে বদলাচ্ছে তাতে আর কিছুদিন পর বাংলা ছবিও পরিবারের সকলের সঙ্গে বসে দেখা যাবে না। জনৈকার অভিজ্ঞতা: তিনি ৯ বছরের ছেলেকে নিয়ে 'গোপাল ভাঁড়' দেখতে গিয়েছিলেন। বিরতির পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মুখে খেউড় শুনে তিনি হতভম্ব। ছেলেটি নাকি যার তার সামনে গেয়ে উঠছে—চারি জাতি কামিনী চারি জাতি।

শতকরা ২৯ জন দর্শক বাংলা ছবিকে নিছক আনন্দ উপকরণ বলে মানতে নারাজ। তারা বাংলা ছবি দেখেন মূলত চারটি কারণে—(১) বাংলা সিনেমার ধারাটা কোন পথে চলছে সেটা বোঝার জন্যে, (২) বাংলা ছবি দেখে শিক্ষালাভ করার জন্য, (৩) অন্য ভাষায় তৈরি ছবির সঙ্গে তুলনামূলক বিচারের জন্য, (৪) আরট ফিলম দেখার জন্য।

বাঙালী দর্শকদের ৯০ শতাংশই দেখেন হিন্দি ছবি। শতকরা ২০ জন হিন্দি ছবি দেখেন শুধু মারপিট দেখার জন্য। নাচ, গান, ফটোগ্রাফী, দেশবিদেশের দৃশ্য এবং কিছু পরিমাণে মারপিট আকর্ষণ করে ৩৭ শতাংশ দর্শককে। হিন্দি ছবিতে অনর্থক নাচ, গান, মারপিট একেবারেই পছন্দ নয় শতকরা ৩৫ জন দর্শকের। এরা দেখেন মূলত হিন্দি আরট ফিলমগুলো। এরা অঙ্কুর, নিশান্ত, মন্থন জাতীয় ছবিই বেশী পছন্দ করেন। আনন্দের জন্যই হিন্দি ছবি দেখেন কিন্তু হিন্দি ছবির কোনটা তাকে বেশি আকর্ষণ করে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে অক্ষম—এ ধরনের দর্শকদের হার ৮ শতাংশ।

গত এক বছরে আপনি কটা বাংলা ছবি দেখেছেন?—এ প্রশ্নের উত্তর নিচে দেওয়া হল:

| ১টি থেকে | ৩টি বাংলা ছবি দেখেছেন | মোট দর্শকের ১০ শতাংশ |
|---|---|---|
| ৪ | ৬ | ১৮ |
| ৭ | ৯ | ৩০ |
| ১০ | ১২ | ১৪ |
| ১৩ | ১৫ | ১৪ |
| ১৬ | ১৮ | ৬ |
| ১৯ | ২১ | ৪ |
| ২১ এর অধিক | | ২ |
| সকল | | ২ |

সবচেয়ে বেশি সংখ্যক দর্শকের ভাল লেগেছে 'গণদেবতা'।

'গণদেবতা' সবচেয়ে ভাল লাগার যে কারণগুলি দর্শকেরা দিয়েছেন সেগুলি হল : গ্রামীণ ভারতবর্ষের একটি বাস্তব ছবি, গ্রাম্য জীবনের স্বাভাবিকতা, অভিনয় যথাযথ, লেখক যেটা বোঝাতে চেয়েছেন পরিচালক সেটা ফুটিয়ে তুলেছেন। আগুন লাগার দৃশ্য, ঝড়ের দৃশ্য, ঝগড়ার দৃশ্যের জবাব নেই। ছবি মন্থর ছিল না। কালার ও ক্যামেরার কাজ ভাল।

এছাড়া দর্শকদের ভাল লাগার তালিকায় আছে—নৌকাডুবি, মাদার, দুই পৃথিবী, সবুজ দ্বীপের রাজা, দৌড়, জয় বাবা ফেলুনাথ, হীরে মানিক প্রভৃতি।

গত এক বছরে আপনি যে কটা বাংলা ছবি দেখেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ লেগেছে কোন ছবি? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা প্রায় এগারোখানা ছবির নাম পেয়েছি এবং বেশ কিছু ছবির নাম একাধিক দর্শক করেছেন। খারাপ লাগার তারা যে কারণগুলি দিয়েছেন সেগুলি হল :

(১) অবাস্তব গল্প [ পংখীরাজ, রাজনন্দিন ], (২) অভিনয় জঘন্য [ পংখীরাজ, নবদিগন্ত ], (৩) জঘন্য পরিচালনা [ পংখীরাজ ], ছবি।

নাচ বাংলা ছবিতে থাকলে ক্ষতি নেই—এ অভিমত ৮৪ শতাংশ দর্শকের। তবে এদের দাবি সে-নাচ যেন সুপ্রযুক্ত হয়। যে পরিস্থিতিতে নাচ দর্শকদের কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হবে না সেগুলি হল :

(১) ছবিতে যদি কোন মেলার দৃশ্য থাকে সেখানে, (২) ছবিতে যদি কোন নৃত্যনাট্যের দৃশ্য থাকে সেখানে, (৩) স্কুলে বা বাড়িতে নাচ শেখানো হচ্ছে সেখানে, (৪) ছবিতে যদি কোন জমিদার বাড়ির দৃশ্য থাকে সেখানে, (৫) পিকনিকে গিয়ে নাচানাচি করছে—এ দৃশ্য চলতে পারে, (৬) গ্রামীণ যাত্রার দৃশ্যে চলতে পারে, (৭) কোন ফাংশনের দৃশ্যে নাচ চলতে পারে, (৮) মুঘল পিরিয়ডের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে নাচের প্রয়োজনীয়তা আছে, (৯) কোন নর্তকীর জীবন নিয়ে যদি ছবি হয় তবে নাচ চলতে পারে।

স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বহু দর্শক কোন কোন সিচুয়েশনে নাচ চলেনা ছবির নাম সহ তার বেশ কিছু উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন :

১) 'সিংহদুয়ার' ছবিতে দাদা নেচে নেচে গান গেয়ে গেয়ে লোককে ভাইয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করছে—এটা কোন মতেই সহ্য করা



(৪)বেমানান অভিনেতা [ কৃষ্ণসুদামা ],(৫)অনর্থক বাড়ানো হয়েছে [ পংখীরাজ, তিলোত্তমা ], (৬) অপ্রয়োজনীয় গান [ জি টি রোড,বিচার ] (৭) অহেতুক জুডো ক্যারাটের ছড়াছড়ি [ এই তো সংসার ], (৮) অনর্থক হাসানোর চেষ্টা [ পংখীরাজ ], (৯) শুধু কাঁদানোর চেষ্টা [ মান অভিমান, সিংহদুয়ার ], (১০) ন্যাকা মারকা ছবি [ ঘরের বাইরে ঘর ], (১১) স্লো ছবি [ পংখীরাজ ]।

যে সব দর্শক 'স্লো ছবি' এই কথাটা ব্যবহার করেছিলেন তাদের আমরা প্রশ্ন করেছিলুম যে তারা কাকে স্লো ছবি বলেন। দর্শকেরা উত্তর দিয়েছেন এইভাবে :

(১) একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি, (২) একই দৃশ্য অনেকক্ষণ ধরে চলা, (৩) দুঃখের দৃশ্য অনেকক্ষণ ধরে চলা, (৪) যেটা না দেখালেও [illegible]ত সেটা দেখানো, (৫) অ্যাকশনহীন ছবি, (৬) নতুনত্ব কিছু থাকে না, শুধু আগের ছবির পুনরাবৃত্তি, (৭) সংলাপে ঠাসা ছবি, (৮) যখন মনে হয় গল্পটা টেনে বাড়ানো হয়েছে, (৯) দুঃখের



"গোপাল ভাঁড়"

যায় না।

২) 'গোপাল ভাঁড়' ছবিতে চারিজাতি কামিনী সংগীতযুক্ত নাচের কোন প্রয়োজন ছিল না।

৩) 'নিশান' ছবিতে আরতি ভট্টাচার্যের মুলোমাথায় লেবু কানে অর্থাৎ সর্বাঙ্গে আনাজের গয়না পরা নাচ অসহ্য।

৪) 'সোনাবৌদি' ছবিতে ক্যাবারে নাচটা অতি জঘন্য।

৫) 'ঘরের বাইরে ঘর' ছবিতে নাচ না থাকলেও কোন ক্ষতি ছিল না।

১৬ শতাংশ দর্শক মনে করেন বাংলা ছবিতে নাচের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

বাংলা ছবিতে গানের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই—একথা মনে করেন ৮ শতাংশ দর্শক। গান ভাল লাগে ৯২ শতাংশ দর্শকের। যে যে দৃশ্যে গান চলতে পারে বলে দর্শকদের ধারণা সেগুলি হল :

(১) গান শেখানো হচ্ছে এরকম কোন দৃশ্যে, (২) বাথরুমে গিয়ে নায়ক বা নায়িকা গান

গাইতে পারে, (৩) রেডিওতে গান হতে পারে, (৪) কোন বিয়ে বাড়িতে বাসরঘরে গান চলে, (৫) ছেলেমেয়ে গান গেয়ে পিকনিকে যাচ্ছে, (৬) হোলির দৃশ্যে গান চলতে পারে, (৭) কবির লড়াইয়ের দৃশ্যে, (৮) জন্মদিন অনুষ্ঠানে বাচ্চাদের গান, (৯) কোন ফাংশনে গান হচ্ছে, ( ১০) প্রণয় দৃশ্যে চললেও চলতে পারে যদি নিতান্ত দরকার হয় এবং উপস্থাপনা ভাল হয়।

ট্রাজেডিতে গান অনেকের পছন্দ আবার অনেকের পছন্দ নয়।

গান যে সব পরিবেশে চলে না দর্শকদের নিম্নোক্ত কিছু উক্তিই সেটা প্রমাণ করেঃ

১ ) 'মাদার' ছবিতে 'আমার নাম এ্যান্টনি' গানটা ঢোকানোর জন্যই যেন সিকোয়েনস তৈরি করা হয়েছে। চৌরঙ্গী দিয়ে কোন লোক লাফাতে লাফাতে গান গাইতে গাইতে চলেছেন এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ?

২ ) 'বিচার' ছবিতে ফুচকাওয়ালার মুখে গান—এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব ব্যাপার।

৩ ) 'অসাধারণ' ছবিতে 'আমার মা ভাল ছিল আমার বাবা ভাল ছিল'—এ ধরনের ন্যাকা মার্কা গান অসহ্য।

৪ ) 'নন্দন' ছবিতে ভাই অসুস্থ বলে গ্রাজুয়েট দিদি কেঁদে কেঁদে রাস্তায় গান গাইছে। পুরোপুরি ছেলেমানুষী পোশাক-আশাক দেখে কখনই মনে হচ্ছিল না তার সত্যিই ওরকম অভাব।

৫ ) 'রাজনন্দিনী' ছবিতে সুখেন দাসের মুখে গান অসহ্য।

বাংলা ছবির গানের মান নিম্নগামী এ বক্তব্য ৫৬ শতাংশ দর্শকের। ২৬ শতাংশ দর্শক মনে করেন বাংলা ছবির গানের মান যথেষ্ট ভালো। বাংলা ছবির গানের ভালও নয় খারাপও নয় এ বক্তব্য ১৮ শতাংশ দর্শকের।

নায়কের সৌন্দর্য নয়, স্মার্টনেসই একমাত্র কাম্য ৬৬ শতাংশ দর্শকের। ২২ শতাংশ দর্শক মনে করেন নায়কের চেহারা অবশ্যই সুন্দর হওয়া উচিত। নায়কের চেহারা সবসময়ই চরিত্রানুরূপ হওয়া উচিত—এ বক্তব্য ১২ শতাংশ দর্শকের।

৬৪ শতাংশ দর্শক নায়িকা সুন্দরী হওয়াটা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন। নায়িকার চেহারা নিয়ে মাথা ঘামান না ২৪ শতাংশ দর্শক। শতকরা ১২জন মনে করেন নায়িকার চেহারা চরিত্র অনুযায়ী হওয়া উচিত।

শতকরা ৫৪জন দর্শক মনে করেন সেনসার ব্যবস্থা থাকা উচিত। সেনসারশিপ থাকা একেবারে উচিত নয়—একথা মনে করেন শতকরা ২২জন। সেনসার ব্যবস্থা কিছুটা উদার হওয়া উচিত একথা মনে করেন ১৫ শতাংশ দর্শক। বর্তমান সেনসার ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়—একথা মনে করেন শতকরা ২জন দর্শক। সেনসার ব্যবস্থার দোষ-গুণ সম্পর্কে কোন ধারণা নেই তাই মন্তব্য করতে নারাজ—এ ধরণের দর্শকের হার ৬ শতাংশ।

যারা সেনসার ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার বিপক্ষে তাদের যুক্তি হল ১ ) সেনসারশিপ না থাকলে বেশ কিছু পরিচালক, পরিবেশক, প্রযোজক এমন ছবি তৈরি করবেন যা পরিবারের সকলের সঙ্গে বসে দেখা যাবে না।

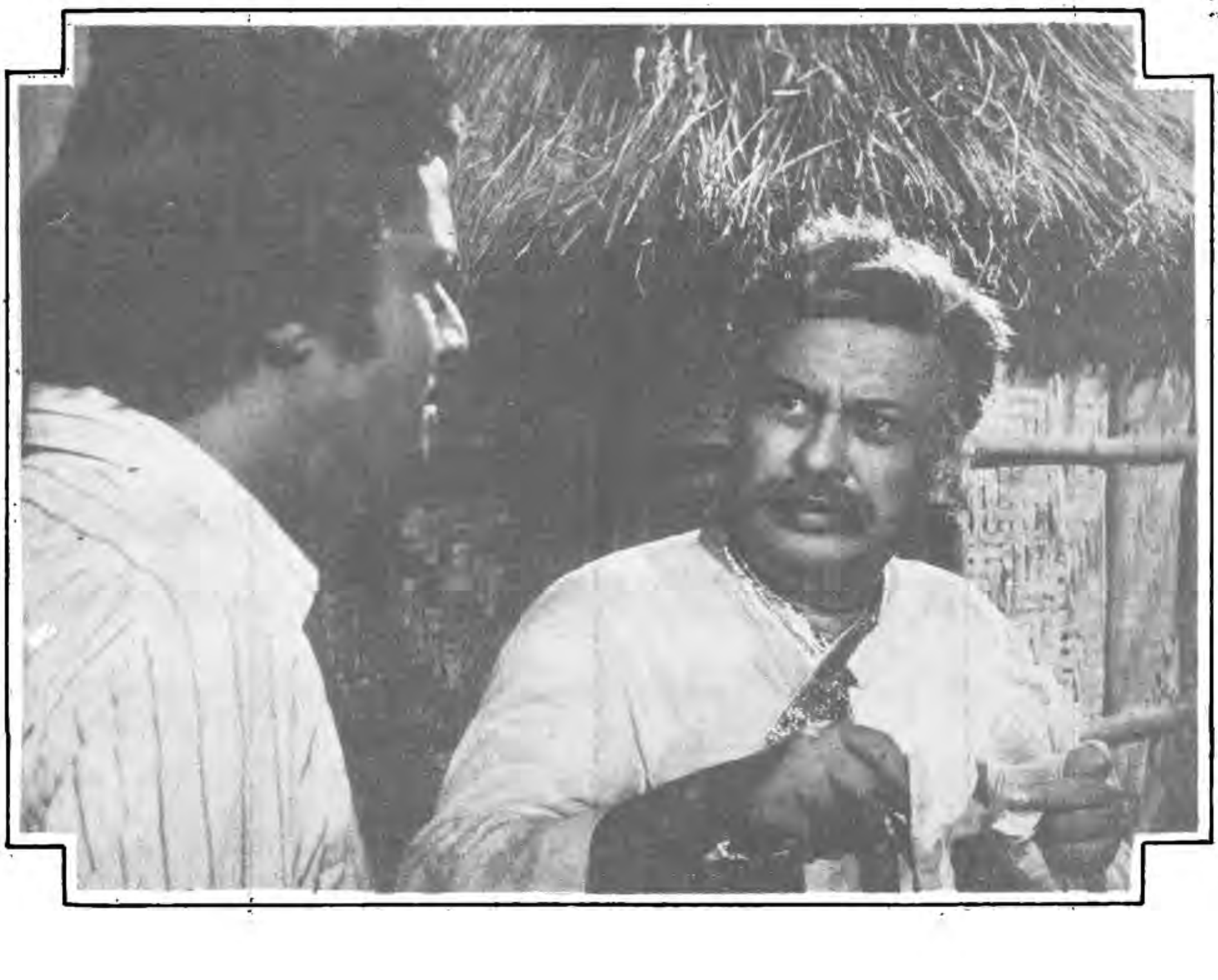
২ ) সেনসারশিপ তুলে নিলে সেকস নিয়ে ব্যবসা শুরু হয়ে যাবে।

যাদের মতে সেনসার ব্যবস্থা থাকা উচিত নয় তারা বলেন—

১ ) প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আজ যদি কোন ছবি হয় তবে সেনসার কর্তৃপক্ষ কিছুতেই সেটা পাস করবে না। অর্থাৎ সততাকে এখানে সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হচ্ছে।

২ ) ছবির প্রয়োজনে নগ্ন দৃশ্য বা চুম্বনের দৃশ্য অনিবার্য হয়ে দাঁড়ালেও সেনসার কর্তৃপক্ষ সেটা পাশ করেন না।

এক ভদ্রমহিলা ( ৩৫ ) তো স্পষ্টই বললেনঃ 'সেনসারশিপ থাকা সত্ত্বেও তো 'হার নাইটস', 'এ প্যাশনেট লাভার', 'সেকসী ড্রিমের' উৎপাদন রোধ করা যায়নি। যারা 'ঘাটশ্রাদ্ধ', অশ্বথামা', 'ওকা উরি



"সিংহদুয়ার"

কথা' তৈরি করার তারা ঠিকই তাদের কাজ করে যাবেন। বরং সেনসারশিপ তুলে দিলে তাদের কাজের সুবিধা হবে। সেনসার ব্যবস্থা তুলে দিলে হয়ত প্রথম প্রথম ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তৈরি ছবিতে নগ্ন দৃশ্যের ছড়াছড়ি হবে, কিন্তু একসময় মানুষ বিরক্ত হয়ে ঐসব ছবি দেখা ছেড়ে দেবে। হয়ত এমন' অবস্থা হবে যে ঐসব ছবিতে লাইন দেওয়াটাই একটা কুরুচির পরিচায়ক হয়ে দাঁড়াবে। আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের শিল্পীরাও এমন কোন দৃশ্যে অভিনয় করবেন না যাতে তাদের শিল্পীসত্তা কলুষিত হয়।'

পরের প্রশ্ন ছিল, এমন কোন ছবির নাম আপনি করতে পারেন কি যে ছবি আপনি দেখবার অযোগ্য হবে বলে ধরে নিয়েই দেখতে যাননি? আপনি কি করে বুঝলেন বা জানলেন যে ছবিটা দেখার অযোগ্য? এ প্রসঙ্গে দর্শকেরা প্রায় ২৬টি ছবির নাম করেছেন। তাতে দেখা গেছে— বন্ধুদের কাছে বিরূপ সমালোচনা শুনেই ছবিটা দেখতে যাননি মোট দর্শকের ৩৯ শতাংশ। কোন ছবি দেখতে গিয়ে 'আসিতেছে' মার্কা পরের ছবির অ্যাডভারটাইজমেনটের রিল দেখেই ছবিটা সম্পর্কে বিতৃষ্ণা জন্মেছিল মোট দর্শকের ৪ শতাংশের। ছবির নাম দেখেই ছবিটা দেখতে উৎসাহিত বোধ করেননি এরকম দর্শকের সংখ্যা মোট দর্শকের ১৪ শতাংশ। রুচিহীন পোস্টারিং কোন ছবি দেখা থেকে বিরত করেছে মোট দর্শকের ৮ শতাংশ দর্শককে। নামকরা অভিনেতা বা অভিনেত্রী ছিলেন না বলেই ছবিটা দেখতে যাননি ৭ শতাংশ দর্শক। নামী পরিচালকের ছবি নয় বলেই দেখতে যাননি ৮ শতাংশ দর্শক।

ছবি সম্পর্কে কাগজেই বিরূপ সমালোচনা ছবি দেখা থেকে নিবৃত্ত করেছে ২ শতাংশ দর্শককে। 'কেন ছবি দেখেননি'—এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম দর্শকের হার শতকরা ১৮ শতাংশ।

পরের প্রশ্ন ছিল—কিছু ছবি আপনি দেখেন কিছু ছবি আপনি দেখেন না। কি ভাবে আপনি ঠিক করেন কোন ছবি দেখবেন এবং কোন ছবি দেখবেন না? এর উত্তরে জানা গেছে শতকরা ২৮ শতাংশ দর্শক ঠিক করেন পরিচালকের নাম দেখে। ছবির কাহিনীকারের নাম দেখে ছবি দেখেন ২০ শতাংশ দর্শক। বন্ধুদের মতামতকেই প্রধান গুরুত্ব দেন ১৯ শতাংশ দর্শক। ১৮ শতাংশ দর্শক ভাল অভিনেতা বা অভিনেত্রীর নাম দেখে তবে ছবি দেখতে যান। ছবির নাম শুনে যদি ভালো লাগে তবেই ছবি দেখতে যান ৬ শতাংশ দর্শক। কাগজের সমালোচনা পড়ে ছবি দেখেন ৬ শতাংশ। ৩ শতাংশ দর্শক কোন কিছুতেই গুরুত্ব দেন না, বাংলা ছবি হলেই তারা দেখেন।

| | কত শতাংশ দর্শক | | |
|---|---|---|---|
| কি ধরনের ছবি | সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন | মোটামুটি পছন্দ করেন | একেবারে পছন্দ করেন না |
| রাজনৈতিক ছবি | ১২% | ৩২% | ৫৬% |
| হাসির ছবি | ১৯% | ৫৫% | ২৬% |
| দুঃখের ছবি | ৬% | ৫০% | ৪৪% |
| মারপিটের ছবি | ৪% | ৩৬% | ৬০% |
| আধ্যাত্মিক ছবি | ২% | ১৬% | ৮২% |
| প্রেমের ছবি | ২৩% | ৬৭% | ১০% |
| গোয়েন্দা ছবি | ৮% | ৭৮% | ১৪% |

| | কত শতাংশ দর্শক | | |
|---|---|---|---|
| গুরুত্বের বিষয় | সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন | মোটামুটি গুরুত্ব দেন | একেবারে গুরুত্ব দেন না |
| পরিচালকের নাম | ২৮% | ৬২% | ১০% |
| লেখকের নাম | ২০% | ৫০% | ৩০% |
| বন্ধুদের মতামত | ১৯% | ৫১% | ৩০% |
| অভিনেতার নাম বা অভিনেত্রীর নাম | ১৮% | ৬২% | ২০% |
| কাগজের সমালোচনা | ৬% | ৫৮% | ৩৬% |
| ছবির নাম | ৬% | ২২% | ৭২% |


'মান অভিমান'

কাগজের সমালোচনাকে যে সব দর্শক একেবারেই গুরুত্ব দেন না সেই সব দর্শকদের প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তারা কেন কাগজের সমালোচনাকে গুরুত্ব দেন না। তাদের অধিকাংশেরই বক্তব্য:

১) কখনও কখনও এমনও হয়েছে কাগজে কোন ছবির খুব ভাল সমালোচনা পড়ে ছবিটা দেখতে গিয়ে ভাল লাগেনি।

২) কখনও কখনও এমন হয়েছে কাগজে কোন ছবির খারাপ সমালোচনা পড়ে ছবিটা দেখব না ঠিক করেছি, কিন্তু বন্ধুদের অনুরোধে সে ছবিটা দেখার পর ভাল লেগেছে।

৩) সমালোচনাতো পয়সা খাইয়ে লেখানো হয়। এ ধরনের মনোভাব পোষণকারী দর্শকের সংখ্যা কম।

কোন ধরনের বিষয়বস্তুসম্পন্ন ছবি দর্শকদের সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে একথা জানতে চাওয়া হয়েছিল। দেখা গেছে প্রেমের ছবি সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে ২৩ শতাংশ দর্শককে। এদের প্রথম পছন্দ প্রেমের ছবি। ১৯ শতাংশ দর্শকের সবচেয়ে ভাল লাগে যে কোন ধরনের হাসির ছবি। রাজনৈতিক বিষয়বস্তু সমন্বিত ছবি আকৃষ্ট করে ১২ শতাংশ দর্শককে। ৮ শতাংশ দর্শক সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন গোয়েন্দা ছবি। যে ছবিতে প্রেম, হাসি এবং দুঃখ সমানভাবে থাকবে সে ছবিই সর্ব প্রথমে দেখতে যাবেন ৭ শতাংশ দর্শক। দুঃখের ছবিই সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে ৬ শতাংশ দর্শককে। ৫ শতাংশ দর্শকের সবচেয়ে ভাল লাগে সায়েনস ফিকশন। সামাজিক সমস্যা বা মানবিক সমস্যামূলক ছবি ৪ শতাংশ দর্শককে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে। মারপিট থাকলেই ছবিটা দেখতে যাবেন ৪ শতাংশ দর্শক। ২ শতাংশ দর্শক সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন দেবদেবতার ছবি বা কোন মহাপুরুষের জীবনী নিয়ে ছবি। যে ছবি সব টাইপের ঊর্ধ্বে সে ধরনের ছবি চান ২ শতাংশ দর্শক। কোন বিশেষ ধরনের ছবির প্রতি মোহ নেই ৮ শতাংশ দর্শকের।

ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনাই যে বেশ কিছু অবাস্তব দৃশ্যের জন্মদাতা দর্শকদের দেওয়া নিচের কয়েকটি উদাহরণ তার প্রমাণ:

১) 'রাজনন্দিনী' ছবিতে বন্দুকের গুলিতে উত্তমকুমারের গলা ফুটো হয়ে যাবার পরও কিভাবে উনি ডায়ালগ ছাড়েন বুঝলাম না।

২) 'বনবাসরের' ভিলেন নিজের গলায় গুলি করার পরও ডায়ালগ

বলে যাচ্ছে।

৩) 'সমাধান' ছবিতে সাপটা শাশুড়ীকে যেমনভাবে কামড়ালো যেন মনে হল সাপটা আগে থেকে জানত শাশুড়ী বউকে বঁটির ওপর ধাক্কা মারবে। সাপটাও যেন রেডি ছিল বউ মরলেই কামড়াবে।

৪) 'বন্দী' ছবিতে উত্তমকুমারের অসিযুদ্ধ দেখে মনে হল যেন উনি তলোয়ার হাতে টুইস্ট করছেন।

৫) 'বিচার' ছবিতে পুত্রস্নেহে অন্ধ বাপের রাত দুটোর সময় ছেলেকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে তরমুজ খাওয়ানো পুরোপুরি অবাস্তব।

৬) 'মাদার' ছবিতে অমল পালেকর যখন গান গাইছেন কি পরিষ্কার বাংলা, আর যেই বাংলা কথা বলতে আরম্ভ করলেন মনে হল জিভ খুলে বেরিয়ে যাবে।

৭) 'গণদেবতায়' স্বদেশীটা যে কেন এল আর কেন গেল বুঝলাম না। তবে আমার মনে হয় দুর্গার ইমেজ বৃদ্ধির জনাই স্বদেশীটা হঠাৎ ঐ গ্রামে ঢুকে পড়েছিল।

৮) 'এইতো সংসার' ছবিতে ভিলেনের হাতে মহুয়ার চাবুক খেতে খেতে ঠাকুমাকে দেখে তড়াক করে উঠে দাঁড়ানো অবাস্তব। কেননা কিছুক্ষণ বাদেই দেখতে পাই ঐ একই চাবুকের আঘাতে ভিলেনের মুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে।

৯) 'বাবা তারকনাথ' ছবিটা গোটাটাই অবাস্তব।

১০) কোন ছবিতে নায়ক-নায়িকা একসঙ্গে বেরিয়েছে রাস্তায় বৃষ্টি এলে। এর অনিবার্য পরিণতি একটা গান। এবং গান শেষ হলেই আমরা বুঝে যাই নায়িকার গর্ভবতী হতে আর বেশি দেরী নেই। যেমন 'আরাধনা'।

শেষ প্রশ্ন ছিল একটা বাংলা ছবিতে কি কি গুণ থাকা জরুরী বলে আপনি মনে করেন। এ প্রসঙ্গে অধিকাংশ দর্শকের প্রধান চাহিদাগুলো নিচে বিবৃত হল ঃ

১) নতুন ধরনের গল্প। গল্প বাস্তব হোক বা না হোক অধিকাংশ দর্শক যেটা চান তা হল আগের যে ছবিগুলো তারা দেখেছেন তার সঙ্গে বর্তমানে যে ছবিটা দেখছেন তার মিল না থাকে এবং পরিচালনার গুণে ছবিটা যেন মন্থর না হয়।

২) সাদা কালো ছবি বন্ধ করে কালার ছবি করা হোক। অধিকাংশ দর্শকেরই সাদাকালো ছবি দেখতে এখন একেবারেই ভাল লাগছে না।

৩) নতুন মুখ চাই। একই অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দেখে দেখে দর্শকেরা ক্লান্ত।

৪) ছবির প্রয়োজনে যদি মারপিট দরকার থাকে তবে মারপিট থাকলে ক্ষতি নেই, কিন্তু সে মারপিটকে যেন আসল মারপিটের মত মনে হয়।

৫) যেখানে সেখানে গান না ঢুকিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী গানের ব্যবহার। তাতে গানের সংখ্যা কমে ক্ষতি নেই।

৬) যাকে যে চরিত্রে মানায় না তাকে সে চরিত্র না দেওয়াই ভাল।

৭) সাধারণত আনন্দের জন্যই সিনেমা দেখা, কাজেই দুঃখের দৃশ্য যত কম থাকে ততই ভাল।

৮) সাউনড সিসটেম ভাল থাকা দরকার; কেন না অধিকাংশ ছবির কথাই বুঝতে পারা যায় না।

৯) যথাযথ অভিনয় দরকার।

১০) ভালো পরিচালনা।

১১) বাংলা ছবিতে ক্যাবারে নাচ বা ঐ ধরনের নাচ না থাকলেই সবচেয়ে ভালো।

এই সমীক্ষা চালাতে গিয়ে বেশ কিছু মন্তব্য পাওয়া গেছে। সেগুলি নিচে দেওয়া হল ঃ

১) অধিকাংশ প্রথিতযশা পরিচালক কোন একটা সমস্যা নিয়ে হয়ত ছবি করলেন কিন্তু সে সমস্যার সমাধান কোথায় তা দেখালেন না বা সে সমস্যা সৃষ্টি হল কার দোষে তাও নির্দেশ করলেন না। সমস্যা আছে এতো সত্যি কথা কিন্তু সে সমস্যার সমাধান যদি পরিচালক না দেখাতে পারেন তবে তার সঙ্গে একজন সাধারণ দর্শকের বুদ্ধির পার্থক্য কোথায়?

২) বাংলা সিনেমা শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা উচিত এবং কিছু সিনেমা হলও রাষ্ট্রায়ত্ত করা উচিত।

৩) বেশ কিছু রুচিহীন অশিক্ষিত ব্ল্যাকমারকেটিয়ার নিজেদের

কালো টাকাকে সাদা করার উদ্দেশ্য নিয়েই বাংলা ছবিতে টাকা ঢালে। বই মার খেলেও তাদের কিছু আসে যায় না।

এই ধরনের ফেরেব্বাজ প্রযোজকের তৈরি ছবি দেখে দর্শকদের বাংলা ছবি সম্পর্কে ধারণা খারাপ হয়ে যায়।

৪) বাংলা ছবিকে স্মার্ট হতে হবে যাতে সে অন্য ভাষায় তৈরি ছবির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।

৫) বর্তমানে বাংলা ছবির যা অবস্থা তাতে দু'একটা বাদে পয়সা খরচ করে দেখার মত নয়। অবশ্য এর মানে এই নয় যে আগের ছবিও (ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে) এর চেয়ে কিছু ভাল ছিল।

৬) পরিচালকেরা ভাবে দর্শকেরা বোকা তাই 'সিনেমার' নামে যা খুশি তাই করে যাচ্ছে।

৭) বাংলা ছবি মানে ছেঁদো সেনটিমেনট।

৮) অর্থনৈতিক কারণে বাংলা ছবি মার খাচ্ছে দর্শকদের সজাগ হওয়া প্রয়োজন। খারাপ ছবি যেমন দেখবে না তেমনি ভালো ছবিকে প্যাট্রোনাইজ করার এই মুহূর্তে ভীষণ প্রয়োজন। চলচ্চিত্রকারদের উচিত শুধুমাত্র দর্শকদের পকেটের দিকে না তাকিয়ে ভাল ছবি করা। আগামী দিনের দর্শকেরা সেটা গ্রহণ করবেন।

৯) অনেক নতুন পরিচালক দুম করে ডাইরেকশন দেন। তারা হয়তো স্টুডিওতে সামান্য কাজ করতেন, কিন্তু তার আরও কাজ শেখার দরকার ছিল বা পড়াশুনার দরকার ছিল। এই পরিচালক নিজের ছবির তো বারোটা বাজালেনই এবং সেই সঙ্গে বাংলা ছবি সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে দিলেন।

উপরোক্ত সমীক্ষা থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার। তা হল—অধিকাংশ দর্শকই চান ছবি তৈরির ক্ষেত্রে আন্তরিকতা। ছবি তৈরিটা যেন ছেলেভুলোনো ব্যাপার না হয়। হিন্দি ছবির ক্ষেত্রে এই সিরিয়সনেসটা কিছুটা পাওয়া যায়। বাস্তব-অবাস্তব যে গল্প নিয়েই ছবি তৈরি হোক না কেন পরিচালনার গুণে ছবিটা এমন পর্যায়ে চলে যায় যে দর্শক ক্লান্ত বা অবসন্ন বোধ করেন না। হিন্দি ছবির আর একটি গুণ সে ছবি দর্শকদের স্নায়ুর উপর এমন চাপ সৃষ্টি করে না যাতে অসহ্য লাগে। হিন্দি ছবিতে দর্শকদের কেঁদে ফেলবার অবকাশ কম।

কলকাতা শহরে রমরম করে হিন্দি ছবি চলে তার অন্যতম কারণ হিসাবে বলা যায় কলকাতা শহরের তেতাল্লিশ শতাংশ অধিবাসীই অবাঙালী। হিন্দি ছবি যেসব হলে চলে তার পঁচাত্তর ভাগ পূর্ণ করেন এরা, আর বাকি পঁচিশ ভাগ পূর্ণ করেন কলকাতার বাঙালীরা। অবশ্য কিছু ব্যতিক্রমও আছে যেখানে এর উল্টোটা ঘটে। কলকাতার সমস্ত বাঙালী যদি একযোগে হিন্দি ছবি পরিহার করেন তা হলেও হিন্দি ছবির বাজার কলকাতায় খুব একটা সংকুচিত হবে না। অবাঙালী দর্শকেরা খুব কমক্ষেত্রেই বাংলা ছবির হলের দিকে ভুল করে তাকান।

বাঙালী দর্শকদের একটি বিশেষ টাইপের প্রতি দুর্বলতা আছে—এটা ডাহা ভুল কথা। কারণ অতীতে যে কটা ছবি হিট করেছে তার প্রতিটিই এক একটি নতুন টাইপ। প্রসঙ্গক্রমে সংসার সীমান্তে, জয় বাবা ফেলুনাথ, গণদেবতা, সাত পাকে বাঁধা, স্বাতী প্রভৃতি ছবির নাম করা যেতে পারে। তবে অনেক ভাল ছবিও যে দর্শকেরা দেখেন না একথা অস্বীকার করা যায় না। এর মূলে পরিচালকদের অক্ষমতাও কিছু পরিমাণে দায়ী। একটা ভাল বিষয়বস্তুকে নিয়ে কিভাবে ছবি করলে দর্শকদের কাছে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে এ সম্পর্কে উদাসীনতা বহু ভাল বিষয়বস্তু সম্পন্ন ছবিকে মার খাইয়েছে। পরিচালনার দোষে সেই ভাল বিষয়বস্তুও দর্শকদের কাছে ভাল থাকেনি, বিরক্তির কারণ হয়েছে।

বাংলা সব গল্প-উপন্যাস যদি একই বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে একটু ওলট-পালট করে লেখা হত তবে পাঠকরা দু-একটা বই পড়ার পর বাংলা বই পড়া ছেড়ে দিত এবং পাঠতৃষ্ণা মেটাতে অন্য ভাষায় সাহিত্য পড়ত। বাংলা ছবির ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। অধিকাংশ বাংলা ছবির বক্তব্য একই বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খাচ্ছে। বাংলা ছবি পুরোপুরি ভুল বোঝাবুঝির উপর দাঁড়িয়ে আছে বললে কিছু ভুল কথা বলা হয় না। অধিকাংশ ছবিতেই থাকে হয় স্বামী-স্ত্রীর ভুল বোঝাবুঝি নয় প্রেমিক-প্রেমিকার ভুল বোঝাবুঝি আর নয় দাদা-ভাইয়ের ভুল বোঝাবুঝি। ইদানীং এই ভুল বোঝাবুঝি সিরিজে নতুন সংযোজন শাশুড়ী-বৌ ভুল বোঝাবুঝি। "ছবি দেখে বিচার করুন কে দোষী, শাশুড়ী না পুত্রবধূ?"—দ্রষ্টব্য।

বাংলা ছবির ক্ষেত্রে একটা মজার ব্যাপার প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। যদি কোন বিশেষ ছবি হিট করলো আর রক্ষে নেই। পরপর সাতখানা ঐ ধাঁচের ছবি বেরিয়ে গেল। প্রযোজক, পরিবেশক, পরিচালকেরা ছবি করবার আগে একবারও ভেবে দেখলেন না যে, দর্শক ছবি দেখতে যান নতুনত্বের জন্যে কোন হিট ছবির কার্বন কপি দেখতে নয়।

বেশ কিছু পরিবেশক, পরিচালক, প্রযোজকের ধারণা ভুল বোঝাবুঝি এবং কান্না না থাকলে বাংলা ছবি হয় না। তাদের এই ধারণার প্রতিফলন আমরা প্রায় প্রতিটি ছবিতে দেখতে পাই। অস্বীকার করি না যে কিছু দর্শক হয়ত এসব পছন্দ করেন। কিন্তু পরিবেশকদের ধারণা অনুযায়ী সব দর্শক এসব পছন্দ করেন—এ কোনমতেই গ্রহণযোগ্য



"বনবাসর"

নয়। তাহলে বাংলা ছবির দর্শক সংখ্যা দিন দিন কমত না। তবে হিন্দি স্টাইলে বাংলা ছবির পশ্চিমবাংলায় যে কোন ভবিষ্যৎ নেই 'নিশান' আর 'বন্দী' সেটা প্রমাণ করে দিয়ে গেছে। বরং খাঁটি বাঙালী মানসিকতায় তৈরি ছবি 'গণদেবতা' দেখেননি এরকম বাঙালী দর্শকের সংখ্যা খুবই কম।

বাংলা ছবি পরিবেশনার ক্ষেত্রে পরিবেশকদের এখন প্রায় দিশাহারা অবস্থা। কী ধরনের ছবি করলে যে ভাল চলবে তা তারা বুঝে উঠতে পারছেন না। উল্টোপাল্টা ছবি করার ফলে বাংলা ছবি যেমন দিন দিন দর্শক সংখ্যা হারাচ্ছে তেমনি তাদের ব্যবসাও দিন দিন সংকুচিত হচ্ছে। বাংলার দর্শকদের ক্রমাগত বাজে ছবি দেখে দেখে এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে বর্তমানে তারা ছবি দেখার আগে হয় পরিচালকের নাম দেখেন, আর নয় কাহিনীকারের নাম দেখেন, আর না হয় অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম দেখেন। নাম ডাক আছে এরকম কেউ ছবিতে থাকলেন তো তারা দেখতে গেলেন, আর না হয় দেখতেই গেলেন না।

এ অবস্থায় পরিবেশক, প্রযোজকদের উচিত যে সমস্ত পরিচালকদের নাম ডাক আছে বর্তমানে তাদের দিয়ে ছবি করানো। কারণ মোট দর্শকদের ২৮ শতাংশই পরিচালকদের নাম দেখে তবে ছবি দেখতে ঢোকেন। পরিবেশকরা যদি কোন ভাল লেখকের গল্প বা উপন্যাস এদের দিয়ে চিত্রায়িত করতে পারেন তবে মোট দর্শকের আটচল্লিশ শতাংশ দর্শক তাদের বাঁধা। তবে গল্প নির্বাচনের ব্যাপারে পরিচালকদের উপর পরিবেশকরা ছড়ি না ঘোরালেই সবচেয়ে ভাল করবেন। কারণ পরিচালককে তার রুচি অনুযায়ী ছবি করতে দেওয়াই সবচেয়ে ভাল। সিনেমা-শিল্প এই ধরনের পরিচালকদের হাতে থাকলে ছ্যাবলামির পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে না।

কথা উঠতে পারে—তবে কি নতুন পরিচালকদের সুযোগ দেওয়া

হবে না ? নিশ্চয়ই দেওয়া উচিত। কিন্তু এই মুহূর্তে কোন প্রয়োজন নেই। একটা মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎসার জন্য কেউ নিশ্চয়ই এমন ডাক্তার ডাকবেন না যার একটাও রোগী দেখার অভিজ্ঞতা নেই অথবা এমন ডাক্তার ডাকবেন না যার চিকিৎসার ক্ষেত্রে সেরকম সুনাম নেই।

অরডিন্যানস জারি করে পশ্চিমবাংলার সব হলে বাংলা ছবি চালানোর কথা তো বেশ কিছুদিন ধরে শোনা যাচ্ছে। সাধু উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু এতে কি লাভ হবে ? হিন্দি ছবি চলছে বলেই বাংলা ছবি চলছে না—এটা তো প্রকৃত অবস্থা নয়। হিন্দি ছবির জন্যই বাংলা ছবির এই দুর্দশা—এই যদি প্রকৃত অবস্থা হত তবে যে কটা মুষ্টিমেয় হলে বাংলা ছবি চলে সেগুলোতে সব সময়ই 'হাউসফুল' বোরড টাঙানো রয়েছে দেখতে পাওয়া যেত। অরডিন্যানস জারি করে পশ্চিমবাংলায় হিন্দি ছবির বাজার সংকুচিত করা গেলেও বাংলা ছবি সম্পর্কে দর্শকদের এই যে বিতৃষ্ণাবোধ তা রোধ করা যাবে কি ? অরডিন্যানস জারি করে কিছু বাংলা ছবির মুক্তি ঘটানো গেলেও হল যদি খালি যায় সেখানে অরডিন্যানস কি করবে ? তখন হয়ত এই অরডিন্যানসকে বাঁচাতে আর এক অরডিন্যানস আনতে হবে যাতে প্রত্যেক পশ্চিমবঙ্গবাসী বাঙালীকে বাধ্যতামূলকভাবে বছরে পাঁচশটা ছবি দেখতেই হবে। অরডিন্যানস জারী করে খারাপ মাল বাজারে চালু করা বেশি জরুরি, না যে মেশিন থেকে খারাপ মাল বেরুচ্ছে সেটা সারানো বেশি জরুরি ?

পশ্চিমবাংলার ফিলম ইনডাসট্রিকে যদি বাঁচাতেই হয় তবে অরডিন্যানসের থেকেও যেটা বেশি জরুরী তা হল ফিলম শিক্ষার স্কুল। উপযুক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোন শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। আজ অবধি সিনেমা-শিল্পে এই রাজ্যে যারা নাম করেছেন তারা প্রত্যেকেই নিজস্ব প্রতিভাবলে উঠেছেন। কিন্তু তাদের সেই প্রতিভাকে আমরা এমনভাবে কাজে লাগাতে পারিনি যাতে আর একটি প্রতিভার বিকাশ ঘটতে পারে। একথা ঠিক যে স্কুল প্রতিভাধর সৃষ্টি করতে পারে না, কিন্তু একথাও ঠিক স্কুলই প্রতিভাধর সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি করে। সংগঠিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ছাড়া কোন শিল্পের উৎকর্ষ সাধন অসম্ভব।

উপযুক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে পারলে সিনেমা-শিল্পের এই আকাল দূর হবেই। তবে সিনেমা-শিল্পের ক্ষেত্রে যেটা মর্মান্তিক সত্য তা হল—সিনেমা শিল্পটা যতটা না শিল্পীদের হাতে, তার চেয়েও বেশি শিল্পপতিদের হাতে। যার এলেম আছে, তিনি একদিস্তা কাগজ এবং এক দোয়াত কালি পেলেই সাহিত্য রচনা করতে পারেন। কিন্তু সিনেমা এমনই এক শিল্প, প্রযোজক এবং পরিবেশকের আনুকূল্য ছাড়া কোন পরিচালকের পক্ষেই সৎ কিছু সৃষ্টি করা সম্ভবপর নয়। জানিনা বাংলা সিনেমা-শিল্প কোন দিন আর্থিক পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাবে কিনা। এ ব্যাপারে সাম্প্রতিক সরকারী প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

তবে সবচেয়ে দুঃসাধ্য কাজ দর্শক-রুচির মূল্যায়ন। ভাল ছবির সংজ্ঞা শহরে একরকম গ্রামে আর একরকম। শহরের দর্শকেরা বস্তাপচা সেনটিমেনট আখ্যা দিয়ে যে ছবিটিকে বাতিল করলেন, সেই ছবিই গ্রামে গিয়ে অনায়াসে হিট করে যায়। আবার অনেক উঁচুমানের আবেগহীন ছবি গ্রামের দিকে একেবারেই চলে না। এর অন্যতম কারণ হিসেবে বলা যায়—গ্রামের প্রায় শতকরা ৮০ জন মানুষই নিরক্ষর। এরা কাগজ দেখেন না, গল্প-উপন্যাস পড়েন না এবং খুব কম গ্রামবাসীই থিয়েটার দেখেন। দেখার মধ্যে অধিকাংশ গ্রামবাসী যেটা দেখেন তা হল যাত্রা। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ বাংলা যাত্রার যা হাল তাতে একটি কথাই বলা যায়—বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতি জগৎ এখনও ১৯৩০ সালে পড়ে আছে। কাজেই বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা যে পাল্টাচ্ছে সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই গ্রামের লোকেদের মধ্যে গড়ে ওঠে না। এ অবস্থায় মডারন সিনেমাকে গ্রামের দর্শকের কাছে নিয়ে যেতে গেলে গ্রামের দর্শকদের রুচি পরিবর্তন প্রয়োজন। যারা পড়তে লিখতে জানেন না তাদের কাছে বড় লেখকের গল্প-উপন্যাসকে সিনেমার মাধ্যমেই নিয়ে যেতে হবে। সিনেমাই একমাত্র মাধ্যম যেটা বুঝতে লেখাপড়ার খুব একটা প্রয়োজন হয় না।

তবে বাংলা ছবি যদি এখনই কোন নতুন দিকে বাঁক না নেয় তবে চোখ বুজে বলে দেওয়া যায়—আর দশ বছর পর বাংলা সিনেমাকে খুঁজতে হবে ইতিহাসের পাতায় এবং বাংলা ছবি দেখতে হলে যেতে হবে মিউজিয়ামে। □

**একটা কথা খোলাসাপটা বলা দরকার যে, শিক্ষিতদেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত এ মতটা ঘরোয়া পরিচালকের নিজের নয়। এটা একটা Motion, যা সামনে রেখে তিনি দু'দলকে লড়িয়ে দিয়েছেন এবং নিজে রেফারির মত ছুটোছুটি করছেন শিষ্টতার বাঁশি বাজিয়ে। বড় জোর তিনি কখনও সখনও দুয়েকটা ভুলচুক বা ফাউল দেখেও দেখবেন না আসর সরগরম রাখবার জন্যে। আর একটা কুয়াশা পত্রদাতাদের কাটিয়ে উঠতে হবে। যারা লিখছেন 'এ বিষয়ে বিতর্ক করার কোন সার্থকতা নেই' তাদের অনুরোধ করবো এ দেশের নানাদিকে ছড়িয়ে থাকা অন্যতর বৃহৎ বিতর্কে 'জড়িয়ে পড়ুন। অনর্থক আমাদের বিব্রত ও ডাকবিভাগকে বিড়ম্বিত করবেন না। বরং ঐ খামে কিছু ধ্বনি ভরে পাঠিয়ে দিন কারুর অপেক্ষা করা নিটোল কথার নীলাকাশে।**

**এবারকার লেডিজ সিট খালি গেল। অগত্যা এক জেন্টলম্যানের চিঠি দিয়ে সেটা ভরাট করে দিলাম। পরের সংখ্যায় আশাকরি সহযাত্রিণী মিলবে।**

পরিচালনা

নিরঞ্জন চক্রবর্তী

## বরং শুধু অশিক্ষিতদেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত

গ্রামাঞ্চলে অশিক্ষিত জনসাধারণের—'ভোট কি ? ভোট দেব কেন ? ভোট দিয়ে কি পেট ভরবে ?' এরকম প্রশ্নগুলি রাজনৈতিক দলের কর্মীদের ব্যতিব্যস্ত করে। ভোটদান কেন্দ্রে স্বামীর নাম বলতে হবে বা অচেনা লোকদের সামনে যেতে হবে, তাই মেয়েরা অনেকেই ভোট দিতে যেতে চান না। ভোট দিতে গিয়ে অনেকেই ব্যালটের সবকটি প্রতীকে কিংবা টেবিলের গায়ে ছাপ মেরে চলে আসেন। ভোটার লিসটে পিতার নাম ভুল ছাপা হলে রাজনৈতিক কর্মীদের শত অনুরোধ সত্ত্বেও, 'অন্য লোককে বাপ বলতে হবে, তবে ভোট দিতে পাব ?' বলে ভোট না দিয়ে চম্পট দেন। 'কেউ কেউ ভোট দেবার টেবিলে গিয়ে ভোটটা কোথায় দেখতে না পেয়ে টেবিলশুদ্ধ তুলে এনেছে অফিসারের কাছে। অনেকেই যে সচেতনভাবে ভোট দেন না এগুলি তার নমুনা। তবু অশিক্ষিতদের ভোটদান থেকে বঞ্চিত করা যায় না। কারণ এরকম ঘটনা ক্রমশ কমে আসছে।

তাছাড়া অশিক্ষিতদের ভোটাধিকার থাকার জন্য, ভারতবর্ষের রাজনীতি তো এক জায়গায় থেমে নেই। তাদের এই অধিকার আছে বলেই ভোটপ্রার্থীরা অন্ততপক্ষে ভোটের আগে একবার তাদের বাড়িতে পদধূলি দেন।

শিক্ষিতদের অধিকাংশই কোন না কোন পারটির নীতিতে বিশ্বাসী। যারা সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে ভালমন্দ বিচার করে ভোট দেয় তাদের অধিকাংশ অশিক্ষিত। আর্থিক সচ্ছলতার অধিকারীরাই শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রণী। তেতাল্লিশ কোটির বেশি জনসাধারণের অশিক্ষার অন্ধকারে পড়ে থাকার কারণগুলির মধ্যে দারিদ্র্য অন্যতম। সাধারণ মানুষ নিজেদের সবরকম উন্নতির আশায় ভোট দিলে এবং শুধুমাত্র শিক্ষিতদের ভোটাধিকার থাকলে, তারা নিজেদের জন্যই ভোট দেবেন এবং তাদের তৈরি সরকার শিক্ষিতদের মনোরঞ্জনেই বেশি প্রয়াসী হবেন। অশিক্ষিতরা আরও বেশি অবহেলিত হবেন।

তাছাড়া ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোককে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কারও নেই। বরং এর উল্টোটাই হওয়া উচিত, কেবলমাত্র অশিক্ষিতদেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত। যাতে পরবর্তী সরকারগুলি অবহেলিত দরিদ্রদের দিকে নজর দিতে বাধ্য হবেন। এ জন্য ভোটদান ব্যবস্থা তাদের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

**সুনীলকুমার মাহাতো, কানুহার, পুরুলিয়া**

## শিক্ষা মানে তো ধনতন্ত্রের স্বার্থরক্ষা

গত তিরিশ বছরে শিক্ষিতের হার আমাদের দেশে, শম্বুক গতিতে হলেও, বেড়েছে। কিন্তু ভোটের নামে ব্যাপক কারচুপি, প্রভাব বিস্তার ইত্যাদি দুর্নীতিগুলো কি একটুও কমেছে ? সত্তরের দশকে আমরা 'নির্বাচনে রিগিং' শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। রিগিংয়ের যারা উদ্ভাবক তারা কি আপনাদের দেওয়া সংজ্ঞানুসারে শিক্ষিত নন ? রিগিং এমন একটা পদ্ধতি যার মাধ্যমে শিক্ষিত-অশিক্ষিত কারোরই আর কষ্ট করে ভোট দিতে হয় না। সুতরাং শিক্ষিত হলেই দুর্নীতি কমবে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।

আজ আমাদের দেশে যে বিচ্ছিন্নতাবাদ বা সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তারও স্রষ্টা কিন্তু শিক্ষিত সমাজ। প্রশ্ন উঠতে পারে, দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা কম বলেই বিভিন্ন জায়গায় কায়েমী স্বার্থ বিচ্ছিন্নতাবাদ বা সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করছে এবং তার শিকার হচ্ছে অশিক্ষিত দরিদ্র ভারতবাসী। শিক্ষিতের সংখ্যা বেশি হলেই কায়েমী-স্বার্থ পরাস্ত হবে—দেশ দুর্নীতিমুক্ত হবে। যদি তাই হবে, তাহলে আমেরিকা বা বৃটেনের মত দেশে—যেখানে শিক্ষিতের সংখ্যা যথেষ্ট—বর্ণবৈষম্যবাদের মত ঘৃণ্য ব্যাপারগুলো ঘটছে কি করে ?

যদিও বৃটেন বা আমেরিকায় দুই দলের মধ্যে নির্বাচনের লড়াই হয়, লক্ষণীয় ব্যাপার হল, দুটো দলই একই সামাজিক শ্রেণীভুক্ত। আর ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারীর পরও কি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে ঐ সমস্ত দেশের নির্বাচনে দুর্নীতি নেই ?

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে কি দেশে অশিক্ষিতের হার বাড়লেই গণতন্ত্রের পক্ষে মঙ্গল ?

এক্ষেত্রে 'গণতন্ত্র' এবং 'শিক্ষা' সম্পর্কে একটু ভেবে দেখা যাক। ভারতবর্ষে যে গণতন্ত্র প্রচলিত আছে তা ধনিকশ্রেণীর গণতন্ত্র। যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত তাও ঐ শ্রেণীরই স্বার্থে। শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়লেও দেশের জনসাধারণের দুর্গতি মিটবে না। কারণ, আমাদের এমন ভাবেই শিক্ষিত করা হচ্ছে যাতে ধনতন্ত্রের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে।

আমাদের সামাজিক শিক্ষায়, রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। যে শিক্ষার ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা দেশের সত্যিকারের পরিচালকের হাতে ক্ষমতা যাবে, সে শিক্ষাই কেবল দেশকে অর্থাৎ দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টিকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এমন কোন রাজনৈতিক দল বর্তমানে নেই যে জনসাধারণকে সামাজিক রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে এখন পর্যন্ত সংশয়াতীত সততার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে। সুতরাং, যতদিন না তা হচ্ছে, অশিক্ষিতদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত কাজ হবে না।

**পুলককান্তি চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা ৫১**

# দেশে দেশে

## উগানডায় ফিরেছেন ওবোটে এবং ভারতীয়রাও

বল্মীক

উগানডার সাধারণ নির্বাচনে মিলটন ওবোটের প্রত্যাবর্তন আফরিকার ইতিহাসে এক নতুন ঘটনা। দেশের আজীবন স্বাধীনতা সংগ্রামী ওবোটের প্রতি সাধারণ মানুষের ছিল অদ্ভুত শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা। কিন্তু আফরিকার অধিকাংশ দেশের মত এখানেও উপজাতিদের সংখ্যার ওপর রাজনীতির ওঠাপড়া নির্ভর করে। সেদিক দিয়ে ওবোটে ভাগ্যবান। তাঁর নিজস্ব উপজাতিরা উত্তর ও পূর্ব এলাকায় উল্লেখ্যভাবে বসবাস করেন। তারাই এবারে মিলটন ওবোটেকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে এনেছেন।

দেশের সংসদে মোট আসন ১২৬টি। ওবোটের দল উগানডা পিপলস কংগ্রেসের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বাগানডা উপজাতিরা। এরা রোমান ক্যাথলিক মতবাদভুক্ত ডেমোক্রেটিক পারটির সমর্থক। এই বাগানডারা দেশের ৪৪টি আসন দখল করেছে। উগানডা পিপলস কংগ্রেস ১৫টি আসন দখল করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে।

ওবোটের এই স্বাভাবিক প্রত্যাবর্তন কিন্তু সরল পথে হয়নি। বিদেশ সফরকালে মিলটন ওবোটে ক্ষমতাচ্যুত হন এবং হাতে জ্যান্ত কুমীর ছানা নিয়ে রাজনীতির মঞ্চে ঢোকেন সর্বকালের সন্ত্রাসী দাদা ইদি আমিন। ইদি আমিন এসেই তাঁর বিরোধী উপজাতি নেতা এবং সেনাবাহিনীর জওয়ানদের মেরে কচুকাটা করেন। সেই ইদি আমিনকে হটানোর জন্য অতঃপর দুটি সামরিক অভ্যুত্থান হয় এক বছরের মধ্যে। এর মধ্যে একটি ছিল তানজানিয়া সরকারের সমর্থনপুষ্ট।

তিল তিল করে উগানডার স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন মিলটন, সেই স্বাধীনতার পর থেকেই। ইদি আমিন এসেই কুম্ভকর্ণের মত এক পদাঘাতে তাকে ভেঙে চুরমার করে দেন এবং ব্যক্তিগত সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু দেশের বৃহত্তম উপজাতি বাগানডাদের সমর্থন ছিল তার পেছনে। বাগানডাদের উপজাতি-প্রধান কাবাকা তাকে ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন।

কাবাকার এই রাগ ও প্রতিহিংসা-পরায়ণতার যথেষ্ট কারণ আছে। ওবোটে ক্ষমতায় এসেই অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে এই উপজাতি-চালিত রাজনীতি বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। ফলে বিভিন্ন উপজাতির পবিত্র-দলপতি প্রথা রদ করা হয়। এতেই চটে যায় সর্ববৃহৎ উপজাতি সম্প্রদায় বাগানডারা।

বাগানডাদের সমর্থন নিয়ে ইদি আমিন ক্ষমতায় আসার পর দেশের মুদ্রাস্ফীতি শতকরা প্রায় ১০০ ভাগে গিয়ে দাঁড়ায়। এমনও হয়েছে ১০০ উগানডান শিলিংপিছু ৭ কেনিয়ান শিলিং দাম দাঁড়ায়। কেনিয়া ও উগানডার সীমান্ত শহর কিসুমুতে উগানডার ব্যবসায়ীরা মালপত্র বেচতে যেতেন। সেখানে মূলত স্বদেশী মুদ্রার কোন দামই ছিল না। আর উগানডার বাজারে বিক্রি করার সাহস তাদের হত না।

এর ফলে আফরিকার এ অঞ্চলে এক অদ্ভুত বিনিময় পদ্ধতি চালু হয়ে গিয়েছিল। উগানডার কৃষকরা তাদের উৎপাদিত শস্য বেচে তার বিনিময়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য নিয়ে আসত।

মিলটন ওবোটের দল উগানডা পিপলস কংগ্রেস তানজানিয়া ধাঁচের সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। তাঁরা নির্বাচনী ইস্তাহারে ভেঙে যাওয়া অর্থনীতি পুনর্গঠন করার ওপর ঝোঁক দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁদের প্রতিশ্রুতি, উগানডায় একটি শক্তপোক্ত কেন্দ্রীয় সরকার গড়ে তুলতে হবে। তবে সত্যি বলতে কি উগানডারা ভোটদাতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাননি। গত ন' বছর ধরে আমিনের নরকগুলজার দেখার পর তারা পরিষ্কার ভাবেই বুঝতে পেরেছেন, এ মুহূর্তে দেশের কাছে ওবোটের কোন বিকল্প নেই।

উপনিবেশের যুগে আফরিকার দেশে দেশে বহু ভারতীয় গিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করতে শুরু করেন এবং বৃটিশ শিল্পোদ্যোগগুলিতে অংশ নেন। বিশেষত রেলওয়ে নির্মাণ, পোসট এবং টেলিগ্রাম এবং নতুন নতুন কারখানার কুশলী কর্মী হিসাবে তাদের আফরিকায় নিয়ে যাওয়া হয়। মূলত এদের বাস প্রাক্তন বৃটিশ উপনিবেশগুলিতেই। দক্ষিণ আফরিকা, জিমবাবোয়ে, কেনিয়া এবং উগানডা তাদের মধ্যে প্রধান।

একমাত্র উগানডাতেই প্রায় ১০ থেকে ১৫ হাজার ভারতীয়ের বসবাস ছিল। এরা উগানডার অর্থনীতিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। কিন্তু এদের নাগরিকত্ব নিয়ে কিছু জটিলতা ছিল। ইদি আমিন ক্ষমতায় এসেই সব ভারতীয়কেই দেশ থেকে বের করে দেন। তার মধ্যে অনেকে আবার উগানডারই নাগরিক ছিলেন।

ওবোটে দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনে এইসব ভারতীয়দের আবার দেশে ফেরার ডাক দিয়েছেন। ইদি আমিন তাদের যে সব শিল্পোদ্যোগ এবং চাকরি কেড়ে নিয়েছিলেন তাও ফেরত দেওয়া হবে বলে আশা দেখা দিয়েছে। ওবোটের সেনাবাহিনী আগেই হাজার পাঁচেক ভারতীয়কে উগানডায় ফেরার আবেদন জানিয়েছিল। এদের অধিকাংশেরই ব্যবসাপত্তর ছিল কামপালার বড় বড় রাস্তাগুলিতে।

উগানডায় চিনির ব্যবসায় ভারতীয়দেরই প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। তাছাড়া বড় বড় শিল্পোদ্যোগে তাদের উদ্যোগও উল্লেখযোগ্য রকমের। এরা কেউ কেউ ইতিমধ্যে উগানডায় ফিরেছেন, যেমন চিনি ব্যবসায়ী জয়ন্ত মাধবানী। তিনি মারা গেছেন কিন্তু তাঁর স্ত্রী মৃণাল মাধবানীকে চিনির কারখানা খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তিনি প্রায় ২০০ জন ভারতীয় বিশেষজ্ঞকে নিয়ে সেই পুরনো ব্যবসা আবার শুরু করেছেন।

উগানডাকে বলা হয় 'আফরিকার মুক্তো'। সম্ভবত এর জাতীয় সম্পদ এবং প্রাকৃতিক উৎসের জন্যই তার এই নাম। ওবোটে স্বাধীনতার পর এই সম্ভাবনাময় দেশকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহায্য নিয়ে উন্নত করতে চেয়েছিলেন। সে হিসাবে ভারতের সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব ছিল উল্লেখযোগ্য। জুলিয়াস নিয়েরেরের মতন তিনিও মনে করেন পৃথিবীতে ভারত একটি বিশেষ শক্তি হিসেবে রয়েছে। সে জন্য দেশের উন্নয়নে নিয়েরেরের মত ওবোটেও ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা করতে আগ্রহী ছিলেন। এবার ক্ষমতায় ফিরে আসার পর আবার তিনি ভারতের সঙ্গে যে পুরনো সম্পর্ক ঝালাই করে নেবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

খুব একটা কুসুমাস্তীর্ণ পথের ওপর দিয়ে ফিরে আসছেন না মিলটন ওবোটে। তাঁর বিরোধী বাগানডা উপজাতিরা সর্ববৃহৎ বলেই সবচেয়ে বেশি বেগ দেবে তাঁকে। এরা নির্বাচনের ফলাফল বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে কামপালার রাস্তায় রাস্তায় ওবোটে সমর্থকদের সঙ্গে বন্দুকের পাল্লা-লড়াই শুরু করেছিল। কিন্তু সেনাবাহিনীর কম্যানডার টিটো ওকেলো হুমকি দেবার পর তারা দূরাঞ্চলে গা ঢাকা দেয়। ফলে কামপালার রাস্তা জনমানবশূন্য হয়ে যায়। উগানডা পিপলস কংগ্রেসের বিজয় উৎসব দেখার জন্য নিজেরা ছাড়া তখন কেউ আর সেখানে ছিল না। অন্যদিকে ইদি আমিনের নেতৃত্বে বাগানডা গেরিলাবাহিনী দেশের সীমান্তে ওৎ পেতে আছে। একবার রক্তের স্বাদ যে পেয়েছে সে সহজে ছেড়ে দেবে? □

## রাজ্যে রাজ্যে

**নতুন দিল্লি ঃ** ১৯৮২-তে এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হচ্ছে দিল্লিতে। গেমসের দর্শকদের কাছে খবরের কাগজ বিক্রির জন্যে এক নতুন যন্ত্র তৈরি করেছেন বিবেক বিহার গভরনমেনট স্কুলের দুই ছাত্র মাধবীর সিং এবং রাঘবেন্দ্র। তাদের তৈরি এই যন্ত্রের একটি মডেল প্রদর্শিত হচ্ছে স্কুল ছাত্রদের জাতীয় বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে ঃ একটি হিন্দি এবং একটি ইংরেজি নির্দেশক আলো আছে, আর দুটি সুইচ ; নির্দিষ্ট ছিদ্রে পঞ্চাশ পয়সা ফেলে নির্ধারিত সুইচটি টিপলেই নিচে রাখা ট্রে-তে বেরিয়ে আসবে প্রার্থিত কাগজ !

দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র এই দুই খুদে বৈজ্ঞানিক জানিয়েছেন, তারা শিগগিরই এটিকে মালটি চ্যানেলে উন্নীত করবেন এবং এর জন্যে খরচ হবে দেড় হাজার টাকা।

( সানডে স্ট্যানডারড )

**পাটনা ঃ** মড়ার খুলি নিয়ে ব্যবসার একটি 'চক্র' সম্প্রতি ধরা পড়েছে লুলনি জেলার কাশিবাগে, গ্রেফতার হয়েছে দু'জন। দ্বারভাঙার পুলিশ সুপার যমুনা রাম জানিয়েছেন, বিশেষ একটি গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরাই এই খুলির ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। এরা বিভিন্ন কবরস্থান থেকে ও নদীতে ভেসে যাওয়া মতদেহ তুলে মাথার অংশ কেটে নেয় এবং এইসব খুলি চড়া দামে মেডিকেল ছাত্রদের কাছে বিক্রি করে।

এই পুলিশী হানায় একটি শিশুর খুলি সমেত মোট নয়টি খুলি এবং খুলি সংরক্ষণের জন্যে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থও উদ্ধার করা হয়েছে। ( হিন্দুস্থান টাইমস )

**পুনচ ঃ** স্থানীয় এক শিক্ষকের কথা সকলের মুখে মুখে ফিরছে। দু'শ কুড়ি টাকা মাস মাইনের এই শিক্ষকটি সম্প্রতি বিয়ে করেছেন। তার বিয়েতে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা ছিল সাত হাজার ! এই সাত হাজার জনকে চর্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয়র প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করতে খরচ করেছেন এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা। ( স্টেটসম্যান )

**নতুন দিল্লি ঃ** রোগটা ধরা পড়েছিল একশো বছর আগে। কেরালার ১৪ কোটি নারকেল গাছের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক গাছের শিকড় খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেগুলো সুস্থ গাছগুলিরও ক্ষতি করছে। বৈজ্ঞানিকরা দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করার পর সিদ্ধান্ত দিয়েছেন দুষ্টু গরুর থেকে শূন্য গোয়াল অনেক ভালো। অর্থাৎ কিনা সুস্থ-অসুস্থ সব গাছগুলিই কেটে ফেলা দরকার।

জানা গেছে, এতে সময় লাগবে তিরিশ বছর এবং খরচ হবে হাজার কোটি টাকা। সমস্যা হল, এতো টাকা আসবে কোথা থেকে এবং গাছের মালিকরা কি রাজি হবেন, গাছ কেটে ফেলতে ? (ইনডিয়ান একসপ্রেস)

**জয়পুর ঃ** রাজস্থানের অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে এক চলমান হাসপাতাল এখন খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। দ্রুতগামী এক গাড়ির মধ্যে রক্ষিত ঐ হাসপাতালে আছে আধুনিক অপারেশন থিয়েটার, একস-রে করার সরঞ্জাম, ল্যাবরেটরী, দন্ত বিভাগ, ব্লাড ট্রানসফিউশনের যন্ত্রপাতি, জেনারেটর, পাঁচশ রুগীর বিছানা।

বছরে কুড়ি থেকে বাইশটি জায়গায় ক্যামপ বসে। এক একটি ক্যামপের স্থায়িত্বকাল বারোদিন করে। এ ছাড়া চোখের জন্যও আলাদা ক্যামপ হয়। প্রথমটির জন্য প্রতিবারে খরচ পড়ে হাজার চল্লিশ টাকা, আর শেষেরটির জন্য আট থেকে দশ হাজার টাকা।

( ইনডিয়ান একসপ্রেস )

## জেলায় জেলায়

লম্বা চওড়া গোঁফওয়ালা চেকার ট্রেনে উঠলেন, টিকিট চাইলেন। যাত্রী যুবকটি একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট দেখালেন তাকে। কিন্তু কমপারটমেমট ছিল প্রথম শ্রেণীর। অতএব চেকার তাকে বললেন, 'নামতে হবে।' যুবক বললেন ঃ না। অতিরিক্ত মাশুল দিচ্ছি, এই ট্রেনেই আমাকে যেতে হবে।' চেকার নাছোড়। চলল টানাটানি।

এই সময় গারড বাজালেন ভেঁপু। হঠাৎ চেকারবাবু যুবকের সোয়েটার ছিনিয়ে নিয়ে নেমে পড়লেন। আর নেমেই তা অপেক্ষমান সাগরেদকে দিলেন। অগত্যা সেই যুবকটিও চলতি গাড়ি থেকে নামলেন। গেলেন টিকিট কালেকটারদের অফিসে। কিন্তু সোয়েটার পাওয়া গেল না। চেকার জানালেন তিনি ফেলে দিয়েছেন। কারণ বে-আইনীভাবে ট্রেনে চড়লে এ গচ্চা নাকি দিতেই হবে। তবে যুবকটিকে তিনি আর জরিমানা করলেন না।

ঘটনা এখানেই শেষ নয়। তপন নামে এক যুবক এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করলে তখন টিক না থাকায় ঐ চেকারবাবু নগদ পঞ্চাশ টাকা এবং ফাইন বাবদ আঠার টাকা মোট আটষট্টি টাকার হিসেব দিয়ে পঁচাত্তর টাকার সোয়েটার চুরির অভিযোগ থেকে রেহাই পান।

( চ্যালেনজ/রাণাঘাট )

...শিক্ষক সংগঠনের এক হোমড়া-চোমড়া নেতার মেয়ের বিয়ে। বর এলেন ৬টা ৪৫এ। তার বাহন ছিল বরের গাড়ির সাজে সজ্জিত Govt. of West Bengal-এর WMC 7542 কালো এমব্যাসেডর ; সযত্নে Govt. of West Bengal লেখাটি ফুল ঘাস দিয়ে ঢাকা ছিল। ( হিন্দুবাণী/বাঁকুড়া )

সম্প্রতি সিউড়ি থানার কড়িধ্যার হাটতলার বহুদিনের কালীমূর্তি এক সন্ধ্যায় অগ্নিদগ্ধ হয়। জলন্ত মোমবাতি পড়ে গিয়ে প্রতিমার গায়ে সাজানো মালায় আগুন ধরে গিয়ে প্রতিমা বীভৎস রূপ ধারণ করেন। ঘটনার কিছু পরে এক বালিকার ভর হয়। বালিকাটি কালীমূর্তি ধারণ করে বেদীতে উঠে বলে ঃ এখানে মদ আর মাংস নিয়ে যে অনাচার হয়েছে তাতে মন্দির কলুষিত। এ পোড়ামুখ আমার আর কাউকে না দেখিয়ে বিসর্জন কর। নতুন করে আবার পূজা কর। প্রতিমা নির্মাণের এবং বলিদানের কোন প্রয়োজন নাই।

( দিগন্তের ডাক/বীরভূম )

বালুরঘাট সদর ডাক ও তার বিভাগে এবং সমগ্র জেলাতে কর্মী সংকট দেখা দিয়েছে অনেক আগেই। বর্তমানে সে অবস্থা সংকটজনক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েছে। কাজের চাপ বিপুলভাবে বেড়েছে কিন্তু সেই হারে কর্মী সংখ্যা বাড়ানো হয়নি। স্বল্প সংখ্যক কর্মীদের উপর কাজের চাপ পাহাড় প্রমাণ। দৈনন্দিন মানুষের গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয় ডাক বিভাগের ওপর নির্ভরশীল। অতএব এই বিভাগের ভুলভ্রান্তি মানুষের জীবনকে বিপন্ন করতে পারে। স্বচ্ছ ও সুস্থ ব্যবস্থা পেতে গেলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি অবিলম্বে প্রয়োজন।

(বালুরঘাট বার্তা/বালুরঘাট)

মোটর ভেহিকেল অফিসে গাড়ির ফিটনেস সারটিফিকেট দিয়ে থাকেন টেকনিকেল মোটর ভেহিকেল ইনসপেকটর। বীরভূমে কিন্তু গাড়ির ফিটনেস সারটিফিকেট দিচ্ছেন নন-টেকনিকাল মোটর ভেহিকেল ইনসপেকটর যার ড্রাইভিং লাইসেনসও নেই। এমন কি ডি এম পুল মেকানিকও অনুপস্থিত। যার কোন রকম টেকনিকেল জ্ঞান নেই তিনি কি ভাবে ফিটনেস সারটিফিকেট দিচ্ছেন ?

(পল্লীশ্রী/বীরভূম)

সংকলন ঃঃ পরিবর্তন নিউজ সার্ভিস



অরুণ মুখোপাধ্যায়

# 'পরশুরাম' দূরেই থেকে গেল

ভাস্কর চৌধুরী

বামফ্রন্ট সরকার প্রযোজিত ছবির মধ্যে মৃণাল সেন পরিচালিত 'পরশুরাম'ই প্রথম মুক্তি পেল। সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী ছবি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা। সমাজতত্ত্ববিদ ডঃ সুধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সমীক্ষার ভিত্তিতে এ ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য সাজিয়েছেন মৃণাল সেন ও মোহিত চট্টোপাধ্যায় যুগ্মভাবে।

ছবিটি দীর্ঘ দু'বছর মুক্তির অপেক্ষায় দিন গুনেছে। সে সময়ের ছ'বটির মধ্যে দেশী-বিদেশী অনেক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয়েছে। গোটা তিনেক পুরস্কারও জুটেছে তার ভাগ্যে। এ ছবিতে মৃণালবাবু ফুটপাতের মানুষদের জীবন তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। প্রশংসনীয় প্রয়াস। অরুণ মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, নিমাই ঘোষ, আরতি দাস, শ্রীলা মজুমদারের অভিনয় সুন্দর। রণজিৎ রায়ের চিত্রগ্রহণ ও গঙ্গাধর নস্করের সম্পাদনা প্রথম শ্রেণীর। অনেক তির্যক সংলাপ মনকে নাড়া দেয়। এসব গুণ থাকা সত্ত্বেও, আগাগোড়া এক ধরনের নকল স্মারটনেস, সস্তায় বাজি মারার চেষ্টা, গভীরে না ঢুকে দূর থেকে সমস্যাকে দেখা, সর্বোপরি রঙের স্বপ্নময়তা ফুটপাতের পরশুরামকে দূরেই সরিয়ে রাখে।

ছবির শুরুটা এইরকম ঃ রেডিওতে ইংরাজি খবর হচ্ছে। বিত্তবান বাড়িতে নাদুস-নুদুস চেহারার এক যুবক চিৎকার করে কাকে যেন খুঁজছে। যাকে খোঁজা হচ্ছে, সে তখন একতলার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখ দেখায় ব্যস্ত। এ লোকটিরই নাম 'পরশুরাম'। হাঁক-ডাক শুনে সে দ্রুত সিঁড়ি মুছতে থাকে মিডলং শটে। যুবকটি তার কাছে এসে মানিব্যাগটা কোথায় জানতে চায় এবং চোর সন্দেহে পরশুরামকে মারধর করে। পরশুরাম শুধু একবার বলে, 'আমি চুরি করিনি।' প্রহার যখন বেশ জমে উঠেছে, ঠিক তখনই যুবকটির বোন মিড ক্লোজ শটের মধ্যে দিয়ে বারান্দায় এসে বলে, 'চেঁচাচ্ছিস কেন? এই তো তোর ওয়ালেট। ইট ইজ রাইট অন ইয়োর টেবিল।'

এই সরলীকরণ আর যাকেই মানাক, পঁচিশ বছর চিত্রজগতে কাটিয়ে দেবার পর মৃণালবাবুকে অন্তত মানায় না।

নকল স্মারটনেস, মৃণালবাবুর প্রায় সব ছবিতেই থাকে। আদৌ যেখানে প্রয়োজন নেই, সেখানেও উনি অন্তত একটু টেকনিক্যালি ধাক্কা দিয়ে দেন। 'পরশুরাম'ও এর বাইরে নয়। বহুবার ট্রেনের ও মোটর বাইকের শব্দ অকারণে ব্যবহার করা হয়েছে। রাস্তার মাদারীর খেলাকে অত প্রাধান্য দেবার কি আছে? আসলে মৃণাল চাইছিলেন, চমক দিয়ে দর্শকদের কিছু তথ্য সরবরাহ করতে। ফলে, মাদারী আনয়নের উদ্দেশ্য থেকে দর্শকেরা মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। এখান থেকে জানা যায়—পরশুরাম গ্রামের এক মামুলি লোক, পেটের জন্য সে শহরে এসেছে, রোজ রোজ মার খায় বলে মিত্তির-বাবুর বাংলোর কাজ ছেড়ে দিয়েছে, মাত্র পঁচিশ টাকা ধার নেওয়ার জন্য তার বাবার একবিঘে জমি হাতছাড়া হয়ে গেছে এবং কলকাতা শহরে ওর মত নাংগা-ভুখা অনেক আছে।

ছবিতে এসব কথা বলার আর কোন উপায় পরিচালক তৈরি করে নিতে পারেননি। পুরো ব্যাপারটাই কেমন বিচ্ছিন্ন। জাতীয় বাস্তু সম্মেলন দেখানোর পিছনেও সমীক্ষা-প্রাপ্ত কিছু তথ্য সরবরাহ করার উদ্দেশ্য কাজ করেছে। একদিকে প্রাচুর্য, অপরদিকে দারিদ্র এই সরলীকরণ দেখে দেখে দর্শকেরা ক্লান্ত মৃণালবাবুও এ সত্য বিস্মৃত হয়েছেন।

সস্তায় বাজি মারার চেষ্টাও কাহিনীগত সরলীকরণ ছবিটির প্রায় প্রতিটি দৃশ্যে। কখনই কাজ পেতে পরশুরামের কোন অসুবিধা হয় না। সে বহুবার তার পেশা পালটেছে। কাজের জন্য একবারও কারোকে অনুরোধ জানানো বা ঘোরাঘুরির কোন আভাস ইঙ্গিতও ছবিতে আমরা দেখিনি। এসব দেখে 'কাজ-পাওয়া-সহজ-শহরে' দলে দলে গ্রামের মানুষ হানা দেবে না তো? মৃণালবাবু প্রয়োজন মত তাঁর ইচ্ছাপূরণ ঘটিয়েছেন পরশুরামের কাজ-কর্মে। হারানখুড়ো পরশুরামের বিয়ের সংবাদ শুনে যখন বলেন 'বাজনা-বাদ্যি কই?' তখনই দেখা যায় আলোকমালায় সজ্জিত বর্ণাঢ্য

## 'পরশুরাম' সম্পর্কে কিছু তথ্য

১৯৭৯র শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে পরশুরাম ছবিতে অভিনয়ের জন্য রাষ্ট্রপতির ভরত পুরস্কার পেয়েছেন অরুণ মুখোপাধ্যায়। শ্রেষ্ঠ সম্পাদনার জন্য জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন গঙ্গাধর নস্কর।

ছবিটি ১৯৭৯র মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে রৌপ্য পদক পেয়েছে।

পরশুরাম কলকাতায় মুক্তি পাওয়ার আগেই প্রদর্শিত হয়েছে বার্লিন, শিকাগো, ব্রুসলেস, লনডন এবং ম্যানহাইম চলচ্চিত্র উৎসবে। বাঙ্গালোরে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ইনডিয়ান প্যানোরামা বিভাগেও। উৎসবগুলো সবই অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৭৯ সালে।

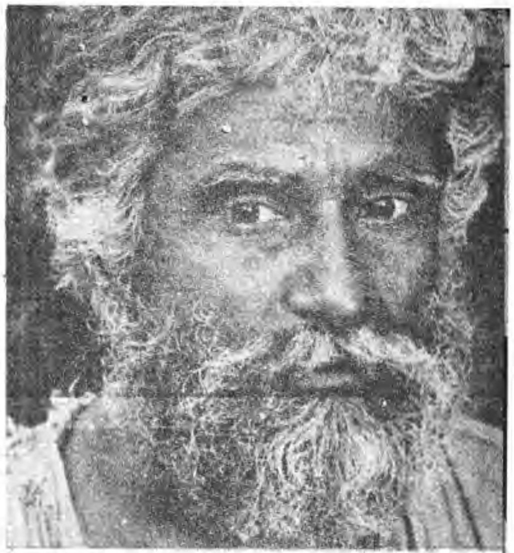


'বিয়ের মিছিলে পরশুরাম হ্যাজাক মাথায় চলেছে। ভাবা যায়? কবরখানায় দাদু মারা গেল কেন? করপোরেশনের গাড়িই বা খবর পেল কোথা থেকে? ছেড়ে চলে যাবার পর আহ্লাদী আবার ফিরে এল কেন? মানুষজন কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও বাচ্চাকোলে ভিখারি মেয়েটি মৃত দাদুর জিনিসপত্র ঘাঁটা-ঘাঁটি করতে লাগলো কেন? চুরি কি সবার সামনে হয়? গোড়ালি পর্যন্ত ধুতি এবং শারট পরে কখনই কোন মিস্ত্রি বা জোগাড়ে ভারা বেয়ে ওপরে ওঠে না, বহুতল বাড়িতে তো কখনই নয়। 'পরশুরামের জয় হোক'এ শ্লোগান হাস্যকর, খুবই হাস্যকর।

আসলে বাস্তবজীবন থেকে বেশ দূরে 'পরশুরাম'-এর অবস্থান। মৃণালবাবু সমস্যাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন, কিন্তু ভাবাতে পারেননি। বাঘ-শিকার-করা, কুড়ুল-কাঁধে পরশুরামের সঙ্গে দর্শক কখনোই একাত্ম হতে পারে না. তার স্বপ্নের সঙ্গে তো নয়ই।

ছবিটি ইস্টম্যানকালার হওয়ার দরুন মনে হয়, মৃণাল সেন যেন বহুতল বিশিষ্ট বাড়ির ছাদ থেকে ফুটপাত বাসিন্দাদের জীবন দেখেছেন। রঙ তো মায়াবী, সমস্যাকে সে ভুলিয়ে দেয়, স্বপ্নের জগতে নিয়ে যায়।

বাংলায় লেখা পরিচয়লিপিতে দেখা গেল, ফটোগ্রাফি রণজিৎ রায়। ফটোগ্রাফির প্রতিশব্দ চিত্রগ্রহণ ব্যবহার করলে কী দোষ হত?



বিভাস চক্রবর্তী



শ্রীলা মজুমদার


ময়লা পরিষ্কারের
সেরা হাতিয়ার
নতুন শক্তিশালী
মিগ ব্লু ডিটারজেন্ট বার
আরও সহজে
লুকানো ময়লা পরিষ্কার করে।
আর তার ফলে জামাকাপড় হয়
ঝকঝকে পরিষ্কার।
আর কি সুবিধাজনক দামে!
আজই মিগ ব্লু কিনুন।
Mig
Mig
Mig
Mig
মিগ
ব্লু ডিটারজেন্ট বার
Mig
HI-POWER
DETERGENT
BAR
মিগ
ACI/KP/4-80B
A Kusum Product

# নাট্য-সমীক্ষা

## পথের পাঁচালী

**প্রযোজনা :** সংলাপ।

**কাহিনী :** বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। **নাটক/প্রয়োগ :** তুহিন দত্ত। **শিল্প ইঙ্গিত :** শ্যামল ব্যানার্জি। **আলো প্রক্ষেপণ :** বিধান গাঙ্গুলী ও আশিস বিশ্বাস। **রূপারোপ :** বিশ্বনাথ সেন। **সহ-পরিচালনা :** কিশোর বিশ্বাস। **আবহ-সঙ্গীত :** শংকর দাশ ও রবীন্দ্রনাথ বোস। **অভিনয় :** ৭ ডিসেমবর, ১৯৮০ রবীন্দ্রভবন, কৃষ্ণনগর।

ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যু দৃশ্য থেকে অপুর গ্রাম ত্যাগ পর্যন্ত টুকরো টুকরো ঘটনা গেঁথে 'সংলাপ' মঞ্চস্থ করেছে দলের দশম বর্ষ পূর্তি প্রযোজনা বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'।

অভিনয়ের আগে প্রাক কথনে যে আত্মবিশ্বাসের উচ্চারণ শুনেছিলাম, রূপারোপে তার যথার্থতা অনুভব করতে পারলাম না। শিউলি আর ঘেঁটু ফুলের সৌরভ শুধু ঘোষণাতেই রয়ে গেল; কারণ ফ্রিজ শটের অতিরিক্ত হোঁচটে তা আর মরমে পৌঁছাল না। অথচ কতকগুলি দৃশ্য পরিকল্পনায় সে প্রতিশ্রুতি ছিল—পাঠশালার পরিবেশ রচনা, ছোট্ট অপু-দুর্গার বড় হয়ে ওঠা (যদিও তা সিনেমাটিক), এবং অপুর বিদায় দৃশ্য।

এ নাটকের শিশু-শিল্পীরা—অপু, দুর্গা, পাঠশালার পড়ুয়া তাদের ভূমিকায় যতটা স্বচ্ছন্দ, বড়রা ততটা নয়। তারা সংলাপ ভুলেছেন, অতি অভিনয় করেছেন। ভূমিকালিপি না হাতে পাওয়ায় নাম জানানো গেল না।

আবহ মাঝে মাঝে সংলাপকে ঢেকে দিয়েছে। আলোক প্রক্ষেপণ দুর্বল।

অজয় বিশ্বাস

## সম্পত্তি সমর্পণ

কাহিনী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নাট্যরূপ। নির্দেশনা : চঞ্চল ভট্টাচার্য। আলো : নিখিল দে। রূপসজ্জা : শচীন আঢ্য। ধ্বনি : কেষ্ট ভট্টাচার্য। মঞ্চ-পরিকল্পনা : সুব্রত গৌতম। প্রযোজনা : সঞ্চারী। অভিনয় : ৮ ডিসেমবর ১৯৮০, অহীন্দ্র মঞ্চ।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের নাট্যরূপ। অর্থপিশাচ যজ্ঞনাথ (গৌরকৃষ্ণ সোম) সঞ্চয়ী স্বভাবের জন্যে ট্র্যাজিক পরিণতির নায়ক। পুত্র বৃন্দাবন (পরিতোষ চক্রবর্তী) গৃহত্যাগী হলো স্ত্রী নিরুপমার (মন্দিরা ভট্টাচার্য) মৃত্যুতে। যজ্ঞনাথ তার সঞ্চয়ের গুপ্ত গহ্বরে নাতিকে নিয়ে এসে নিজের অজান্তে হত্যা করে। এই হত্যার দৃশ্যে শিশুশিল্পীর অসাধারণ অভিনয় বয়স্কশিল্পীদের ম্লান করে দিয়েছে। বৃন্দাবন চরিত্রটিকেই নাট্যকার প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন; গল্পে কিন্তু যজ্ঞনাথই প্রধান চরিত্র। যজ্ঞনাথের অভিনয় যথাযথ। বৃন্দাবন তুলনামূলকভাবে সংলাপ ভারাক্রান্ত। গ্রামীণ যুবকদের রামযাত্রা উপভোগ্য। একটি মাত্র নারী চরিত্রে মন্দিরা ভট্টাচার্যের অভিনয় যথেষ্ট সজীব, কিন্তু কণ্ঠস্বর লালিতাহীন।

নাটকে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার দৃশ্যোপযোগী হয়নি। রবীন্দ্রনাথের গল্পের পটভূমি অধিকাংশই পদ্মাপারের গ্রাম্যজীবন। গেরস্ত বাড়ির আঙ্গিনায় সন্ধ্যাদীপ দেখানো পল্লীবধূর মানসিকতার নেপথ্যে ভাটিয়ালির সুরই মানানসই হতো। নিরুপমার মৃত্যুদৃশ্যে অসহায় পিতার কোলে মাথা দিয়ে মৃত্যুপথযাত্রিণীর মানসিকতা কি 'পুরানো সে দিনের কথা' গানের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেছে? গ্রামের মেয়ের মনে আইরিশ মেলডিজ-এর সুরের সংরাগ কতটা অর্থবহ, ভাবা দরকার।

আলো ও আবহসংগীত কখনোই যথাযথ হয়নি।

সুব্রত রাহা

# সংস্কৃতি-সংবাদ

## ছন্দনীড়ের আবৃত্তির আসর

প্রযোজনা : ছন্দনীড়। সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ : উৎপল কুণ্ডু ও চিন্ময় নন্দী। অনুষ্ঠান : ১৪ ডিসেমবর ১৯৮০, কলকাতা তথ্যকেন্দ্র।

কবি ও আবৃত্তিকারকে একই মঞ্চে পাশাপাশি বসিয়ে কবিতা শোনানোর প্রথম দায়টা ছন্দনীড়ই নিলেন। বাংলা কবিতা পাঠ ও আবৃত্তিকে জনপ্রিয় করার ছন্দনীড়ের প্রয়াস পরিশ্রম অভিনন্দনযোগ্য।

আলোচ্য অনুষ্ঠানে একই কবিতা কবি ও আবৃত্তিকারের মুখে শোনা গেছে। কবি কবিতা রচনা করেন যে আবেগ বুদ্ধি ও শিল্প সুষমায় আবৃত্তিকার সেই আবেগ বুদ্ধি ও শিল্প সুষমাকে কণ্ঠে চারিত করেন। তথ্যকেন্দ্রের অনুষ্ঠান বার বারই যেন বলে দিল কবিতা পাঠ ও আবৃত্তিতে আবেগের চাইতে বুদ্ধি স্বরক্ষেপণের কারিকুরির চাইতে স্বাচ্ছন্দের ছাপ থাকা দরকার বেশি। কবিতাকে পাঠক কিংবা শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য 'সহজ পাঠই' সহজ মাধ্যম।

প্রদীপ ঘোষ, নীলাদ্রীশেখর বসু গৌরী ঘোষ, সুকুমার ঘোষ, জগন্নাথ বসু, অশোক পালিত প্রত্যেকেই আবৃত্তিকার হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। অথচ সেদিন প্রায় প্রত্যেককেই কবিদের সামনে নিষ্প্রভ লাগল। যদিও কবিরা ভদ্রতার খাতিরে প্রত্যেক আবৃত্তিকারকেই প্যাশ নমবর দিয়েছেন, তবুও শ্রোতা-সমালোচক হিসাবে ফারাকগুলো বেশ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছিল। অরুণ মিত্রের, অগ্নি, বলয়ের এপারে কবির গলায় যেমন ব্যঞ্জনা পেলো, অশোক পালিতের কণ্ঠে সুরেলা হয়েও সেই ব্যঞ্জনা পেলো না। গৌরী ঘোষের আবৃত্তিতে ছন্দ ছিল, গভীরতা ছিল না। কবিতা সিংহের পাঠ যন্ত্রণাটাও উপলব্ধি করা যায়। আবার কবি সজল বন্দ্যোপাধ্যায় যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করে 'আমি সারাদিন আমি' পাঠ করেন, আবৃত্তিকার সুকুমার ঘোষ স্বর ছোঁড়ার দক্ষতায় একবারে অন্য ডায়মেনশন নিয়ে আসেন। রজত বন্দ্যোপাধ্যায় পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের 'অভিমন্যু' কবিতাটি আবৃত্তি করার আগে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করলেন; যা ছিল নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। একই দোষে দুষ্ট আরও অনেকেই। তার উচ্চারণে 'দ্রোণ' শুনলাম, ভুল শুনিনিতো।

অমিতাভ দাশগুপ্তের 'শ্মশান থেকে আসছি' কবিতাটি একটি জলন্ত আগুনের গোলা। নীলাদ্রীশেখর বসু আবৃত্তির সময় হঠাৎ দু-তিনটি জায়গায় দ্রুতলয়ে স্বর উচ্চগ্রামে তুললেন কেন? কবির শান্ত ধীর পাঠেই তো অর্থ অপ্রকাশিত থাকেনি; আবহও গড়ে উঠেছিল। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা আলাদা ব্যঞ্জনা পেয়েছে প্রদীপ ঘোষের গলায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে 'পাহাড় চূড়ো' আর 'সেই স্বপ্ন' কবিতা দুটি আবৃত্তি করলেন পার্থ ঘোষ। স্বচ্ছন্দ গতি, দমিত আবেগ তাকে আলাদা করে চিহ্নিত করে দেয়। অবশ্যই তার অন্যতম কারণ কবির অনুপস্থিতি। □

নির্মল ধর

# চিত্র-প্রদর্শনী

## রবীন মণ্ডল

নভেমবরের শেষ সপ্তাহে রবীন মণ্ডলের উনিশটি চিত্রের একটি প্রদর্শনী হয়েছে বিড়লা অ্যাকাডেমিতে। চারটি বোর্ডের ওপর তেলরঙে আঁকা। অপর চিত্রগুলি ছিল মিশ্র মাধ্যম কালি ও জলরঙের।

প্রদর্শিত চিত্রগুলির বিবিধ নাম। নানা উপাধির মানুষ। কেউ রাজা, কেউ রানী, রাজকুমারী অথবা নারী। কিছু শিব মূর্তি, প্রণয়ঘটিত, নৈশজীবন সংক্রান্ত এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধার্থী উপজাতীয় একদল মানুষের চিত্র। বহুমূল্য নামকরণের মধ্যে ছবির বক্তব্য সব সময় স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।



কোন কোন চিত্র দেখলে মনে হয় কঠিন পাথরে গুহা বা পর্বতে খোদাই করা প্রাচীন ছবির প্রতি-চিত্র। কিন্তু মানুষের চেহারা কি এমন খর্ব বিমর্ষ ও যন্ত্রণাবিদ্ধ? এসব চুলচেরা বিচার করার আগেই রবীন মণ্ডলের চিত্রগুলি দর্শকের মনে একটা অসোয়াস্তির ভাব সঞ্চারিত করে। আসলে নামকরণ এই ছবিগুলির পক্ষে বাহুল্যমাত্র। উদ্বেগ, আর্তি, আসঙ্গলিপ্সা, অসূয়া, হিংস্রতা, বার্ধক্য, অতৃপ্তি আত্মবীক্ষণ যাবতীয় মানবিক অনুভূতির ইশারা আছে ছবিগুলির মধ্যে। বস্তুত এই অনুভূতিগুলি প্রাচীন এবং অতি আধুনিকও। মানুষ তার গূঢ় সমস্যাগুলির সমাধান এখনো খুঁজে পায়নি। রঙ ব্যবহারে আশ্চর্য বৈচিত্র্য ও পরিমিতিবোধ দেখিয়েছেন শিল্পী। লাল, হলুদ, সবুজ, কালো, নীল ও বাদামী ইত্যাদি রঙ ব্যবহৃত হয়েছে।

চিত্রগুলির উদ্ভটদর্শন নায়ক-নায়িকাদের দেহস্থূল, উল্কিময় অথবা অলংকৃত। রবীন মণ্ডল লোকশিল্প ও আদিম স্থাপত্য রীতির সমন্বয় ঘটিয়ে সমকালীন মানুষের অন্তর্জীবনের জটিলতার রূপ ফোটাতে চেষ্টা করেছেন। আলোচ্য চিত্রগুলিতে টেকনোলজির প্রভাবজনিত টেনশান অতিরিক্ত প্রাধান্য পেয়েছে বলে মনে হয় না।

প্রণব নাগ

# এই সপ্তাহ

## জানুয়ারি ৭ থেকে ১৩

**মেষ :** শরীর চলনসই ; তবে গলার কোন রোগ সম্পর্কে সাবধান। আর্থিক টানা-পোড়েন চলবে। সঞ্চয়ের সুযোগ সীমিত। কর্মক্ষেত্রে নতুন উদ্যম ও নতুন কারও সঙ্গ আনন্দ দেবে। মেয়েদের কর্মস্থলে অন্যের উপরে দায়িত্ব দিলে বিপদে পড়বার আশংকা। আয়বৃদ্ধি আশা করা যায় না। পারিবারিক সমস্যাগুলো নিজের প্রচেষ্টায় সমাধান হবে। ব্যবসায়ী-দের ঝঞ্ঝাট। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার লাভ।

**বৃষ :** শরীর সামান্য উৎপাত করতে পারে। আর্থিক জটিলতার অবসান। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কারও সঙ্গে মতভেদের আশঙ্কা। মেয়েদের কর্মস্থলে অতি উৎসাহ ক্ষতি করতে পারে। সামান্য আয়বৃদ্ধি হতে পারে। পারিবারিক কোন সমস্যা অস্থির ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলবে। মেয়েদের সৃজনমূলক কাজে সাফল্য ও প্রশংসা। ছোটখাট ভ্রমণ কিন্তু তাতে সামান্য ক্ষতির আশঙ্কা। জমিজমা ক্রয়ের সহজ সুযোগ আসবে। ব্যবসায়ীদের বাধা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার সামান্য লাভ।

**মিথুন :** ছোটখাট অসুস্থতা বেশ খানিকটা বিচলিত করবে। আর্থিক ব্যাপারে অপ্রত্যাশিত শুভ যোগাযোগ। কর্মস্থলে কোন ঘটনা ক্ষতি ও মানসিক অশান্তির কারণ হবে। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা নিতে হবে। আয় বৃদ্ধির অনায়াস সুযোগ। পারি-বারিক দিক থেকে সপ্তাহটা ঝঞ্ঝাটপূর্ণ হলেও অনেক সমস্যায় সমাধান। মেয়েদের কোন তুচ্ছ ব্যাপারে মানসিক আঘাত। অবিবাহিতদের বিবাহ ব্যাপারে কোন যোগাযোগ ভেঙে যেতে পারে। ব্যব-সায়ীদের সাফল্য। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার প্রতারিত হবার আশঙ্কা।

**কর্কট :** শরীর মোটামুটি। আর্থিক ব্যাপার আশাপ্রদ। সহজ সঞ্চয়। কর্মক্ষেত্রে নতুন কোন দায়িত্ব আসতে পারে। মেয়েদের কর্মস্থলে কোন জটিলতা বিপাকে ফেলবে। আয়বৃদ্ধির সুযোগ থাকবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন নিকট আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবার সম্ভাবনা। মেয়েদের কোন বচসার মধ্যে যাওয়া ঠিক হবে না। কর্মপ্রার্থীরা নিজেদের চেষ্টায় কোন সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। সন্তানদের জন্য উদ্বেগ। ব্যবসায়ীদের অহেতুক দুশ্চিন্তা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার কর্মে অসাফল্য।

**সিংহ :** শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। আর্থিক ব্যাপারে অসাফল্য ও মানসিক চাপ। কর্মক্ষেত্রে সামান্য ভুলভ্রান্তি বেশ ক্ষতির কারণ হতে পারে। মেয়েদের কর্মস্থলে কারও বিরোধিতা কোন উদ্দেশ্য পূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। আয় বৃদ্ধির সুযোগ কম। পারিবারিক ক্ষেত্রে অনেক ব্যাপারেই সময় অনুকূল। মেয়েদের বিভিন্ন ব্যাপারে উদ্যম ও চিন্তাধারায় সাফল্য। কর্মপ্রার্থীদের অন্যের সহায়তায় কোন যোগাযোগ। ব্যবসায়ীদের অশান্তি। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার লাভ।

**কন্যা :** শরীর নিয়ে ভোগান্তি চলবে। আর্থিক ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত কোন শুভ ফল। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের ব্যবহার ভাবিয়ে তুলবে। মেয়েদের কর্মস্থলে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে একান্তভাবে স্বাবলম্বী হওয়া প্রয়োজন। আয়বৃদ্ধির সুযোগ আসবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন আপনজনের ব্যবহার ভাবিয়ে তুলবে। মেয়েদের আর্থিক ব্যাপারে শুভযোগাযোগ। কর্মপ্রার্থীদের কোন সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। ব্যবসায়ীদের নতুন যোগা-যোগ। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব।

**তুলা :** পুরনো কোন রোগ বেশ ভোগাতে পারে। আর্থিক ব্যাপারে স্থিতিশীলতা আসবে। কর্মক্ষেত্রে মনের দুর্বলতা ক্ষতির কারণ হতে পারে। মেয়েদের কর্মস্থলে সাময়িক বাধা এলেও পরে সাফল্য। সামান্য আয় বাড়তে পারে পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত। কোন বন্ধুর নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি। বাসস্থান নিয়ে কোন সমস্যা উত্যক্ত করবে। অবি-বাহিতদের কোন প্রচেষ্টায় অসাফল্য। ব্যবসায়ীদের হতাশা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার ক্ষতি।

**বৃশ্চিক :** আগের চেয়ে শরীর ভাল চলবে। আর্থিক কোন সমস্যার অবসান, সঞ্চয়ের ইঙ্গিত। কর্মক্ষেত্রে উৎসাহিত হবার মত কোন যোগাযোগ। মেয়েদের কর্মস্থলে নিজস্ব চিন্তাধারা ও পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হবার সম্ভাবনা। আয় বাড়তে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে মনের দুর্বলতায় বিশেষ কোন সুযোগ হাতছাড়া হবে। মেয়েদের অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভুল পথে চলবার সম্ভাবনা। কোন সন্তানের কর্মে অসাফল্য। কর্ম-প্রার্থীদের দূরে কোন যোগাযোগ ঘটতে পারে। ব্যবসায়ীদের মন্দা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার স্বীয় প্রচেষ্টায় সাফল্য।

**ধনু :** ভাল মন্দ মিলিয়ে চলবে স্বাস্থ্য। আর্থিক ব্যাপারে নতুন আলোকপাত। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কারও সঙ্গে মতানৈক্য। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। আয়বৃদ্ধির ব্যাপারে অন্যের সহায়তা লাভ। পারিবারিক ক্ষেত্রে কারও উপরে নির্ভরতা হতাশ করবে। প্রবাসী কোন আত্মীয়ের দ্বারা উপকৃত হবার সম্ভাবনা। ছোট-খাট ভ্রমণ। জমি-জমা ক্রয়ের সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায়ীদের মন্দা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার কর্মে সাফল্য।

**মকর :** স্বাস্থ্য ভাল চললেও নানা ব্যাপারে মানসিক চাপ চলবে। আর্থিক ব্যাপারে জটিলতা বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে কোন ঘটনায় বিশেষ আশাহত হবার সম্ভাবনা। মেয়েদের কর্মস্থলে কোন ব্যাপারে সাফল্যের মুখে হতাশা। আয়বৃদ্ধির সুযোগ নেই। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন বন্ধুর অযৌক্তিক প্রস্তাব ক্ষতির কারণ হতে পারে। মেয়েদের শরীর ও মন দুইই বিপাকে ফেলবে। হঠাৎ কোন সৎসঙ্গ লাভ। সন্তানদের কারও আঘাত লাগার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ীদের ক্ষতি। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার কোন সমস্যার সুরাহা।

**কুম্ভ :** শরীর ভাল চললেও বড় রকমের আঘাত লাগতে পারে। আর্থিক ব্যাপারে ভাবনা চিন্তার অবসান। কর্মস্থলে মর্যাদা ও দায়িত্ববৃদ্ধি। ক্ষেত্র বিশেষে পরিবর্তনের আভাস। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে কোন সুখবর উৎসাহিত করবে। সহজ সুযোগ আসবে আয় বাড়াবার। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন আপনজন সম্পর্কে উদ্বেগের আশংকা। বিবাহিত মেয়েদের ব্যক্তিগত কোন ব্যাপারে অসাফল্য। জমি-জমা সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যস্ততার ইঙ্গিত। ব্যবসায়ীদের হঠাৎ আর্থিক চাপ। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার কর্মে অসাফল্য।

**মীন :** শরীর চলনসই। আর্থিক প্রচেষ্টায় সাফল্য, ফলে সঞ্চয় বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে কোন দুর্বলতা ব্যক্তিগত ক্ষতির কারণ হতে পারে। মেয়েদের কর্মস্থলে মানসিক চাপ ও কোন সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি। আয়বৃদ্ধির সুযোগ থাকবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে সামান্য কারণে কারও সঙ্গে মন কষাকষি। মেয়েদের সৃজনমূলক কাজে সাফল্য। মূল্যবান কোন জিনিস হারাতে পারে। কর্মপ্রার্থীদের সপ্তাহ মাঝামাঝি শুভ যোগাযোগ। ব্যবসায়ীদের দুর্ভাবনা এই লগ্নের জাতক-জাতিকার লাভ।

বিনয় আচার্য

মুদ্রাকর ও প্রকাশক অরুণকুমার পাল কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী (প্রাঃ) লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩, (ফোন ২৪-৫৫২০), থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী (প্রাঃ) লিমিটেড, ৪৭ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২, (ফোন ২৭-৩৩১৬, ২৭-২১৬৯), থেকে প্রকাশিত


দস্যু মোহন ১৭
মূল কাহিনী ঃ শশধর দত্ত
চিত্র কাহিনী ঃ অলোক দত্ত
শিল্পী ঃ পোলারিস
কাগুলি গুনেও নিতে পারেন
একথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না।
আপনি আমায় বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। আপনাকে আমি সন্দেহ করব, এ হতে পারে না।
মাপা হয়ে গেলে
না, এখান থেকে বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
তাহলে বিয়ের দিন আমি এখানে নিরাপদে থাকতে পারি তো
নিশ্চয়ই! আমি এখন চলে যাচ্ছি। পরে আবার দেখা হবে।
ঠিক আছে, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।
নিয়েল চলে গেলেন। ঘণ্টাখানেক বাদে লোক একটা চিঠি এবং একটি বড় নিয়ে হাজির।
জমিদারবাবু চিঠিটা পড়ে লাফিয়ে উঠলেন।
কী হল স্যার

PARIBARTAN, 7 January 1981, Regn. No. 32815/78, Postal Registration No. WB/CC—380, Rs. 1.50



আলোকচিত্র ঃ অরূপ দত্ত